পেনিসিলিন
ও
ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

সহযোগিতায় ঃ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিবেশনায় ঃ
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

পেনিসিলিন
ও
ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

৯৬০

সহযোগিতায় ঃ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

[...লা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বিজ্ঞান ...াপয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং সমাজের ...বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।]

পরিবেশনায় ঃ

মণ্ডল এণ্ড সন্স

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৫৭
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৯

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
তারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কাঁকিনাড়া,
২৪ পরগণা (উঃ)।

— সূচী —

পেনিসিলিন

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন

পরিশিষ্ট

মুখবন্ধ

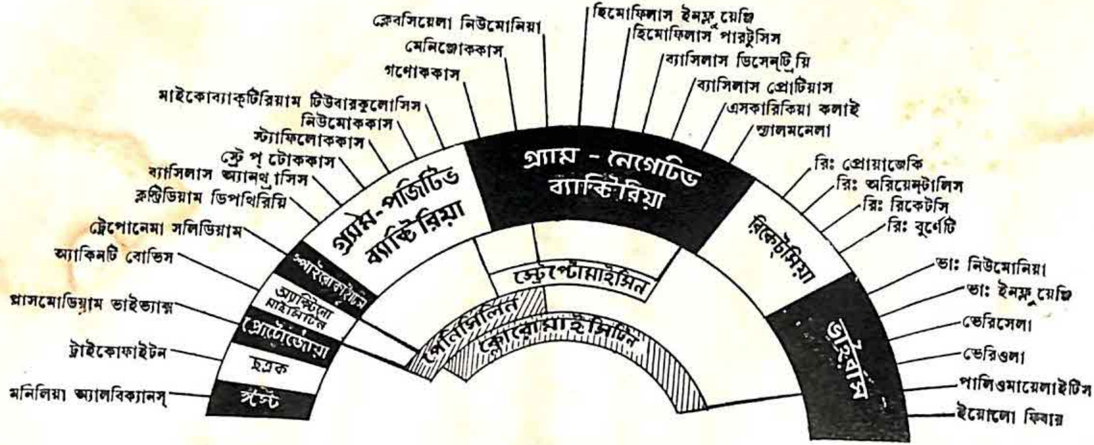
পেনিসিলিনের আবিষ্কার ও ব্যবহারে যে অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর এসেছে তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অসংখ্য রোগী এর ব্যবহারে রোগমুক্ত হয়েছে। মৃতপ্রায় অসংখ্য ব্যক্তি এর প্রয়োগে পুনর্জীবন পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই বস্তু এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনও সম্প্রতি পেনিসিলিনের মত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পুস্তিকায় প্রধানত এই দুটি ঔষধের কথাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হল। এ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিধি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, একজনের পক্ষে সমস্তটা পড়া বা জানা কঠিন। একটি ছোট পুস্তিকায় এর সম্যক বর্ণনা মোটেই সম্ভবপর নয়। এই কারণে পেনিসিলিনের রাসায়নিক প্রকৃতি ও তার কৃত্রিম উৎপাদনের বিষয় জানবার জন্যে যে বিপুল চেষ্টা হয়েছে সে সম্বন্ধে উল্লেখও করা সম্ভব হল না। তা ছাড়া জীববিজ্ঞানে ও রসায়নে প্রচুর জ্ঞান না থাকলে এ বিষয়ে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। এ দুটি ছাড়া অন্য কয়েকটি জীবাণু-শাসকের কথাও 'পেনিসিলিন' অধ্যায়ে এবং পরিশিষ্টে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

আশা করি, এই পুস্তিকা থেকে পাঠকের মনে বিষয়টা ভাল করে জানবার একটা কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

পুর্নমু্দ্রণের সুযোগ নিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার কিছু সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা গেল। বিষয়টি এত জটিল এবং এ বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধের সংখ্যা এত বেশী যে, পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি না করলে এর যথাযোগ্য আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি যে সকল নাশকবস্তুর ব্যবহার এদেশে বেশী চলছে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারে বিপদ সম্ভাবনার কিছু বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। পেনিসিলিন তৈরীর জটিল যন্ত্র সম্ভারের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হোল না। আশা করি বর্তমান পুস্তিকা পাঠকদের কিছু বেশী কাজে লাগবে। ইতি—

গ্রন্থকার



বিভিন্ন রোগ-জীবাণু প্রতিরোধে বিভিন্ন নাশক-বস্তুর কার্যকারিতা

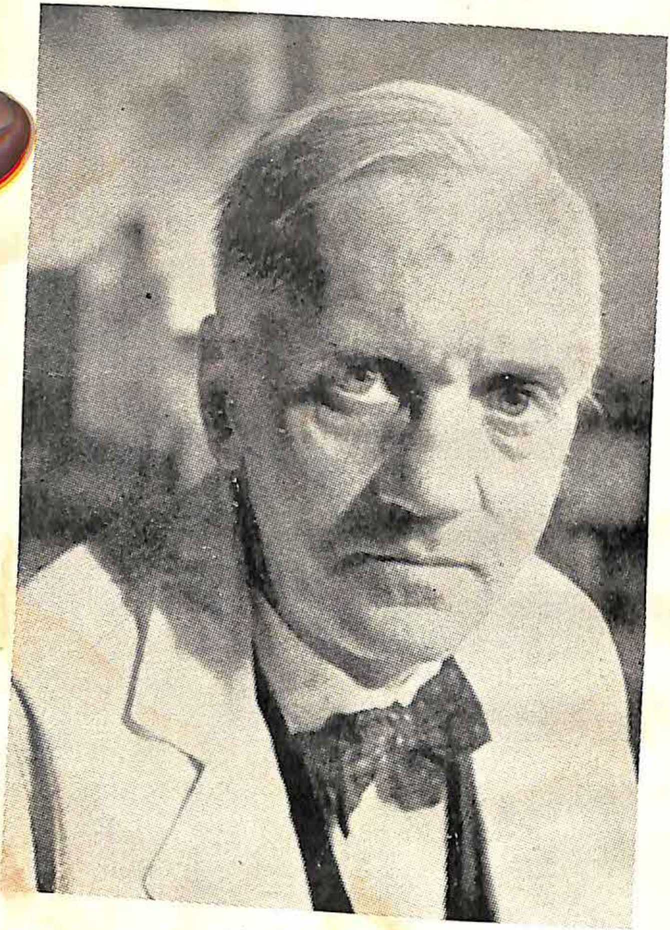
পেনিসিলিন

ভূমিকা

অধিকাংশ প্রাণীই নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। এমন কি, চর্মচক্ষুর অগোচর অণু-প্রাণী এবং অণু-উদ্ভিদেরও নিজ নিজ বিশেষ ব্যবস্থায় আত্মরক্ষা করার দরকার; যেমন দেখা যায়, তাদের কোন কোনটা (1) দ্রুত-বৃদ্ধির ফলে বাসোপযোগী স্থান বা চতুঃপার্শ্বস্থ খাদ্যভাণ্ডারকে শত্রুর চেয়ে তাড়াতাড়ি দখল করে ফেলে; অথবা (2) কোন কোনটা তাদের শরীর থেকে নির্গত এক বা একাধিক নিঃস্রাবের সাহায্যে পোষক-মাধ্যমের অম্লত্ব, অস্রমস চাপ বা পৃষ্ঠবিততি এমনভাবে বদল করে দেয় যে, তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জীবাণুর বাস অসম্ভব হয়ে পড়ে; কিংবা (3) কোন কোনটা আবার তাদের শরীর থেকে এমন বিষবস্তু নিঃসারণ করতে পারে, যা তাদের শত্রুর বৃদ্ধিকে আংশিক বা পূর্ণভাবে দমন করে; এমন কি, এই বিষরস প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীর জীর্ণ করেও ফেলতে পারে। এই শেষোক্ত ক্রিয়াকে কখন কখন 'শাসক'-ক্রিয়া বা নাশকক্রিয়া বলা হয়।

প্রায় 70 বৎসর আগে থেকেই এই ক্রিয়ার উদাহরণ বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। 1877 সালে সুবিখ্যাত ফরাসী

রসায়নবিদ লুই পাস্তর প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর বৃদ্ধি বায়ুবাহিত অন্য কোন কোন জীবাণুর ক্রিয়ায় হ্রাস পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, বহু রোগের জীবাণুযুক্ত পোষক-মাধ্যম (culture medium) মাটিতে পড়লে ভূমিবাসী অন্য জীবাণুর প্রতিক্রিয়ায় তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তাপের সাহায্যে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করলে মাটির এই জীবাণুরোধক শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। 1905 সালে আমেরিকায় ডব্লু. ডি. ফ্রস্ট প্রমাণ করেন যে, ভূমিবাসী অনেক জীবাণু বহু রোগজীবাণুকে নষ্ট করতে পারে। তাঁর মতে এই কারণেই বালক-বালিকারা সারাদিন ধূলামাটি নিয়ে খেলা করলেও বারবার জীবাণুঘটিত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় না। ঐ বৎসরই বৃটিশ জীবাণুবিদ এফ. ডব্লু. টর্‌জও এই রকম ব্যাপার লক্ষ্য করেন। 1917 সালে ফরাসী ডাক্তার ডি. হেরেল কোন কোন ব্যাক্টিরিয়া উৎপাদন করে তাদের পোষক-মাধ্যম হতে তাদেরই বিনাশকারী অথচ বিষক্রিয়াহীন জীবাণু-জারক বস্তু ('ব্যাক্টিরিওফাজ') তৈরি করেন। এই আবিষ্কারে কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর ঘটে। 1927 সালে ইংরাজ ছত্রক-রসায়নবিদ রাইস্ট্রিক পেনিসিলিয়াম সিট্রিনাম নামক ছত্রক থেকে সিট্রিনিন প্রস্তুত করেন। এই বস্তুর যথেষ্ট জীবাণুশাসক-শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরে আরও শক্তিশালী অন্য বস্তু আবিষ্কারের ফলে এর আদর কমে যায়। এইসব আবিষ্কারের পরে অনেকের



পেনিসিলিন আবিষ্কারক
স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

ধারণা হল যে, মানবশরীরে রোগজীবাণু দমন করতে হ'লে জীবাণুনিঃসৃত শাসক-বস্তুর ব্যবহার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। গত শতাব্দীর শেষভাগে নানা দেশে এই বিষয়ে বহু পরীক্ষাও করা হয়, কিন্তু এই সব চেষ্টা সে সময় সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ জীবাণুনিঃসৃত শাসক-বস্তুকে নির্দোষ অবস্থায় উদ্ধার করা তখনও সম্ভব হয়নি। জীবাণুযুক্ত মাটি বা শাসকযুক্ত অশোধিত পোষক-মাধ্যম (কাল্‌চার) নিয়েই পরীক্ষা চলছিল।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার

1929 সালে ইংরাজ ব্যাক্টিরিয়াবিদ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ডিমের সারাংশ থেকে লাইসোজাইম নামক একটি রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করেন। কতকগুলি রোগ-জীবাণুর উপর এর যথেষ্ট শাসক-ক্রিয়া দেখা যায়, তবে একেও কাজে লাগানো সে-সময়ে সম্ভবপর হয়নি। এই বৎসরই কিন্তু ফ্লেমিং ঘটনাচক্রে এমন আর একটি বস্তু আবিষ্কার করলেন, যাতে জীবাণুশাস্ত্রে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে সাড়া পড়ে গেল। ফ্লেমিং সে সময় লণ্ডনে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। কাচের তৈরী 'পেটি-ডিশ' নামক ছোট ও চ্যাপ্টা বাটিতে জেলিজাতীয় আগার-মাধ্যমে তিনি স্ট্যাফাইলোককাস রোগজীবাণু বপন করে রেখেছিলেন সাধারণ কোন পরীক্ষার জন্য। দু-এক দিন পরে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর এই পাত্রে শুধু যে

এই রোগজীবাণুটিই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, আর একটি সবুজ রঙের অনাহুত নূতন ছত্রক সেই আগারের মাঝে মাঝে নিজের উপনিবেশ (colony) স্থাপন করে বাড়ছে। সম্ভবত আগার-মাধ্যম তৈরি করার সময়ে, অথবা স্ট্যাফাইলোককাস রোগজীবাণু বপন করার সময়ে, সামান্য অসাবধানতার ফলে বাতাস থেকে কোন ছত্রক-বীজ তার মধ্যে পড়ে থাকবে। এরূপ ঘটা কিছু অসম্ভবও নয়। সাবধানে পরীক্ষা করে ফ্লেমিং আরও লক্ষ্য করলেন যে, ছত্রকের এই উপনিবেশগুলির চারপাশে ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি যেন কোন মন্ত্রবলে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় সেগুলি একেবারে গলে যাওয়াতে আগার-মাধ্যমটি অন্য অংশের মত ঘোলা না থেকে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তখন সেই ছত্রকের ক্ষুদ্র অংশ অন্য আগারে বা মাংসের রসে পুনরায় বপন করে তিনি নির্ণয় করলেন যে, এই ছত্রকটির বৈজ্ঞানিক নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর ছত্রক অতি সাধারণ হলেও এই বিশেষ প্রজাতিটি মোটেই সুলভ নয়। নিপুণ পরীক্ষায় তিনি প্রমাণ করলেন, এই ছত্রক নিজের বৃদ্ধির সময় শরীর থেকে এমন একটি বিষবস্তু নিঃসারণ করেছে যা স্ট্যাফাইলোককাস প্রভৃতি বহু রোগজীবাণুর বৃদ্ধি দমন করে। নিঃসৃত হলদে রঙের বস্তুটির এই অদ্ভুত গুণ উপলব্ধি করে তিনি এর নাম দিলেন পে নি সি লি ন। সুস্থ প্রাণীর শরীরে এর দ্রবণ প্রয়োগ করে তিনি দেখলেন যে, এই বস্তুর

বিষক্রিয়া নেই বললেই হয়। স্বভাবতঃই তাঁর আশা হল, এই আবিষ্কার চিকিৎসার কাজে লাগানো যাবে। সাধারণ অবস্থায় পেট্রি-ডিসের মত ছোট পাত্রের মাধ্যমে যে পরিমাণ পেনিসিলিন জন্মে তার শক্তি অতি অল্প। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে সময় এই বস্তুকে আরও ঘনীভূত ও বিশোধিত অবস্থায় আনতে পারা গেল না। কিন্তু এই অদ্ভুতকর্মা ছত্রকটিকে ফ্লেমিং ত্যাগ করলেন না। তিনি জীবাণুর মিশ্রণ থেকে কতকগুলি জীবাণুকে নষ্ট করে অন্যগুলিকে বিশোধিত করার কাজে এবং কোন কোন ক্ষত-চিকিৎসায় এই অশোধিত মাধ্যমকেই লাগাতে থাকলেন।

পেনিসিলিনের উৎপাদন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝতে হলে জীবাণু-তত্ত্বের দু-একটা গোড়ার কথা জানা দরকার। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ গাছ যেমন তাদের আপন আপন বীজ থেকে জন্মে, এবং ইচ্ছামত তাদের জন্মাতে ও বাড়াতে গেলে যেমন তাদের বীজকে উপযুক্ত সারবান মাটিতে বপন করতে ও তার জন্য জল, বায়ু ও তাপের সুব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি অনেক ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রকজাতীয় অণু-উদ্ভিদও তার স্পোর বা রেণু থেকে জন্মে ও তার বৃদ্ধির জন্য নানারূপ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সাধারণ গাছের মতই সেই রেণু মাটিতে পড়লে অতি ক্ষুদ্রকায় এককোষী উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয় এবং বংশপরম্পরায় অতি দ্রুতবেগে বংশ বৃদ্ধি

করতে থাকে। অতি ক্ষুদ্র বলেই তারা মাটি ছাড়া অন্য অনেক জিনিসের উপরেও বাড়তে পারে ; যেমন রুটি, ভাত, সিদ্ধ বা কাঁচা তরকারি, গুড় বা চিনির জল, এমন কি ভিজা কাগজ, কাপড় বা চামড়া। এ সকলের উপরে স্বাভাবিক অবস্থায়ই এরা জন্মে ও বাড়ে। এই সব স্থান থেকে তাদের অতি-ক্ষুদ্র অদৃশ্য রেণু হাওয়ার সঙ্গে মিশে নূতন যে-কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এই সব অণু-উদ্ভিদ জাতিতেও যেমন অসংখ্য, এদের আকার-প্রকার, গুণ এবং স্বভাবও তেমনি বিভিন্ন। এদের ভাল করে চিনতে বা পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে পরীক্ষাগারে কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, উদ্ভিদটিকে বার বার উপযুক্ত পোষক-মাধ্যমে জন্মানো, যাতে তার বিশিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং বৃদ্ধির ফলে মাধ্যমে সংঘটিত বিবিধ পরিবর্তন চর্মচক্ষে বা রাসায়নিক পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায়। এই সব খুঁটিনাটি বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করে একটি ছত্রক অন্যটি থেকে আলাদা করে চেনা যায়। এই উদ্দেশ্যে গ্লুকোজ-সম্বলিত মাংসরস এবং সামুদ্রিক শৈবালজাত আগার হতে প্রস্তুত জেলি-জাতীয় মাধ্যমই প্রধান। দ্বিতীয় বস্তুটির সুবিধা এই যে, গরম অবস্থায় তরল থাকলেও ঠাণ্ডা অবস্থায় তা জমে

জেলির মত অর্ধ-কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং নাড়াচাড়ায় স্থানভ্রষ্ট হয় না এবং জীবাণু বা ছত্রকের উপনিবেশগুলিকে অবিচলিতভাবে পৃথক পৃথক গণ্ডিতে ধারণ করে রাখে। এর সঙ্গে অন্য পোষক-বস্তু মিলিয়ে এতে যে-কোন ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া বপন করা যায়। এই সব জীবাণুর কতকগুলি প্লেটের আগারের উপরে, আর কতকগুলি তার মধ্যেই বাড়তে থাকে। দু-এক দিনের মধ্যে সূতো বা শুঁয়ার আকারে ছত্রকের জালক (mycelium) উপ্তি-কেন্দ্রের চারদিকে গোলাকারে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন অণু-উদ্ভিদ আবার বৃদ্ধির সময় বুদ্বুদের আকারে গ্যাস উৎপাদন করে। কোনটি আবার লাল, হলদে, সবুজ, কালো বা নীল রঙের সৃষ্টি করে। এইসব বৈশিষ্ট্য দেখে উদ্ভিদটির স্বরূপ স্থির করা যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্লেটে একের অধিক ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া বপন করলে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়তে থাকে এবং তাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে একটি থেকে আর একটিকে বেছে নেওয়া শক্ত হয় না। সুবিধার জন্য এই বপন কার্য কাচের তৈরী চওড়া, চ্যাপ্টা, অগভীর ও গোল বাটিতে বা ডিসে করা হয়। প্রত্যেকটি বাটিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া অনুরূপ বাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এতে বাতাস থেকে অন্য কোন অণু-উদ্ভিদের রেণু উপ্তিক্ষেত্রে ঢুকতে পারে না। এই ডিসগুলিকে 'পেট্রি-ডিস' বলে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাট্‌জার্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাক্টিরিয়াবিদ অধ্যাপক সেলমান. এ. ওয়াক্সম্যানও ফ্লেমিং-এর মত জীবাণু-শাসক ক্রিয়া বহুবার লক্ষ্য করেছিলেন। ফ্লেমিং-এর কাজে উৎসাহিত হয়ে তিনি এই গবেষণায় দ্বিগুণ মনোযোগ দিলেন। তাঁর একজন সহকর্মী, রেনি ডুবস 1939 সালে রক্‌ফেলার ইনষ্টিটিউট-অব-মেডিক্যাল-রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে এক প্রকার ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে নিঃসৃত এক নূতন বস্তু আবিষ্কার করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, সেই বস্তু নিউমোককাস ও স্টেপ্‌টোককাস নামক জীবাণু দুইটির উপরে প্রবল ক্রিয়াশীল। এর আগেই 1932 সালে অক্সফোর্ড সহরে জীবাণুবিদ ক্লাটারবাক ও লভেল এবং ছত্রক-রসায়নবিদ রাইস্ট্রীক পোষক-মাধ্যম থেকে খাঁটি পেনিসিলিন উদ্ধারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, তাপ, ক্ষার অথবা অম্লের আধিক্যে এ বস্তু সহজে নষ্ট হয় বলেই একে উদ্ধার করা ফ্লেমিং—এর সহকর্মীদের পক্ষে এত কঠিন হয়েছিল। মাধ্যমে কিছু অজৈব অম্ল যোগ করার পর জলে—অদ্রাব্য ঈথার দ্রাবকের সাহায্যে একে উদ্ধার করা যায়। 1938 সালে ইংরাজ জৈব-রসায়নবিদ চেইন ও ফ্লোরি এই বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণায় মনোযোগ দেন। ক্লোরোফর্ম অথবা অ্যামাইল-অ্যাসিটেট দ্রাবকের সাহায্যেও এর উদ্ধার সম্ভবপর

হোল। তাঁরা আরও দেখলেন, শতকরা মাত্র এক ভাগ পেনিসিলিনযুক্ত ঘনীভূত দ্রবণও এত শক্তিশালী যে, 5 লক্ষ গুণ জলে মিশ্রিত করার পরেও তা স্ট্যাফাইলোককাস-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক যত জীবাণু-নাশক বস্তু সে-সময়ে জানা ছিল, তার মধ্যে একমাত্র অ্যাক্রিফ্লাভিনই এর সমশক্তিবিশিষ্ট। ক্রমে ফ্লোরির তত্ত্বাবধানে চেইন, আব্রাহাম ও উইলিয়ম্‌স প্রমুখ একদল জীবাণুবিদ ডাক্তার ও রসায়নবিদ সমবেতভাবে পেনিসিলিন তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তিন বৎসরের সমবেত কঠোর পরিশ্রমেও এই কঠিন সমস্যার মাত্র আংশিক সমাধান হল। বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরে 1940 সালে তাঁরা অল্প পরিমাণে এক রকম কটা রঙের একটা গুঁড়া তৈরি করলেন। তার শাসক-ক্রিয়া খুবই প্রবল দেখা গেল। ইঁদুরের শরীরে স্ট্রেপটোককাস এবং স্ট্যাফাইলোককাস-ঘটিত রোগে এবং কঠিন গ্যাস-গ্যাংগ্রিন রোগে সাল্‌ফানিল-এমাইড পর্যায়ের কৃত্রিম ঔষধের চেয়েও এই বস্তু বহুগুণে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। আবার অপেক্ষাকৃত অশোধিত অবস্থায়ও প্রাণিশরীরে এর বিষক্রিয়া নগণ্য বলে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হলেন। তখন অক্সফোর্ডে উইলিয়ম ডান স্কুল অব প্যাথলজি নামক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীদের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধাসহ এই বস্তু তৈরি ও বিশোধনের

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাট্‌জার্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাক্টিরিয়াবিদ অধ্যাপক সেলমান. এ. ওয়াক্সম্যানও ফ্লেমিং-এর মত জীবাণু-শাসক ক্রিয়া বহুবার লক্ষ্য করেছিলেন। ফ্লেমিং-এর কাজে উৎসাহিত হয়ে তিনি এই গবেষণায় দ্বিগুণ মনোযোগ দিলেন। তাঁর একজন সহকর্মী, রেনি ডুবস 1939 সালে রক্‌ফেলার ইনষ্টিটিউট-অব-মেডিক্যাল-রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে এক প্রকার ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে নিঃসৃত এক নূতন বস্তু আবিষ্কার করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, সেই বস্তু নিউমোককাস ও স্টে্রপটোককাস নামক জীবাণু দুইটির উপরে প্রবল ক্রিয়াশীল। এর আগেই 1932 সালে অক্সফোর্ড সহরে জীবাণুবিদ ক্লাটারবাক ও লভেল এবং ছত্রক-রসায়নবিদ রাইস্ট্রীক পোষক-মাধ্যম থেকে খাঁটি পেনিসিলিন উদ্ধারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, তাপ, ক্ষার অথবা অম্লের আধিক্যে এ বস্তু সহজে নষ্ট হয় বলেই একে উদ্ধার করা ফ্লেমিং-এর সহকর্মীদের পক্ষে এত কঠিন হয়েছিল। মাধ্যমে কিছু অজৈব অম্ল যোগ করার পর জলে-অদ্রাব্য ঈথার দ্রাবকের সাহায্যে একে উদ্ধার করা যায়। 1938 সালে ইংরাজ জৈব-রসায়নবিদ চেইন ও ফ্লোরি এই বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণায় মনোযোগ দেন। ক্লোরোফর্‌ম অথবা অ্যামাইল-অ্যাসিটেট দ্রাবকের সাহায্যেও এর উদ্ধার সম্ভবপর

হোল। তাঁরা আরও দেখলেন, শতকরা মাত্র এক ভাগ পেনিসিলিনযুক্ত ঘনীভূত দ্রবণও এত শক্তিশালী যে, 5 লক্ষ গুণ জলে মিশ্রিত করার পরেও তা স্ট্যাফাইলোককাস-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক যত জীবাণু-নাশক বস্তু সে-সময়ে জানা ছিল, তার মধ্যে একমাত্র অ্যাক্রিফ্লাভিনই এর সমশক্তিবিশিষ্ট। ক্রমে ফ্লোরির তত্ত্বাবধানে চেইন, আব্রাহাম ও উইলিয়ম্‌স প্রমুখ একদল জীবাণুবিদ ডাক্তার ও রসায়নবিদ সমবেতভাবে পেনিসিলিন তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তিন বৎসরের সমবেত কঠোর পরিশ্রমেও এই কঠিন সমস্যার মাত্র আংশিক সমাধান হল। বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরে 1940 সালে তাঁরা অল্প পরিমাণে এক রকম কটা রঙের একটা গুঁড়া তৈরি করলেন। তার শাসক-ক্রিয়া খুবই প্রবল দেখা গেল। ইঁদুরের শরীরে স্ট্রেপটোককাস এবং স্ট্যাফাইলোককাস-ঘটিত রোগে এবং কঠিন গ্যাস-গ্যাংগ্রিন রোগে সাল্‌ফানিল-এমাইড পর্যায়ের কৃত্রিম ঔষধের চেয়েও এই বস্তু বহুগুণে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। আবার অপেক্ষাকৃত অশোধিত অবস্থায়ও প্রাণিশরীরে এর বিষক্রিয়া নগণ্য বলে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হলেন। তখন অক্সফোর্ডে উইলিয়ম ডান স্কুল অব প্যাথলজি নামক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীদের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধাসহ এই বস্তু তৈরি ও বিশোধনের

কাজে লাগানো হল। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ পেনিসিলিন তৈরি করতে যে অত্যধিক শ্রম, সময় ও অর্থ-ব্যয় হল, তাতে তখন কেউ আশা করতে পারেন নি যে, এ দিয়ে কোনদিন সাধারণ লোকের সুলভ চিকিৎসা চলতে পারবে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসায় এর মূল্য বুঝতে পেরে 1941 সালে অক্সফোর্ড-কর্মীদের অগ্রণী অধ্যাপক ফ্লোরিকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে সাব্যস্ত করলেন। এর কারণ, সে-দেশ তখন রাসায়নিক শিল্পে এত উন্নতি লাভ করেছিল যে, একমাত্র সেখানেই কার্যটি সম্ভবপর বলে তাঁদের ধারণা হল। তাছাড়া বোমাবিধ্বস্ত ইংলণ্ডে এই কাজ তখন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বাধাও ছিল প্রচুর।

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা

লোকসানের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও কারখানার মালিকরা এই কঠিন কাজে হাত দিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এর মূল্য সহজেই উপলব্ধি করলেন এবং নর্দার্ন রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে এই কঠিন কার্যের সম্পূর্ণ ভার দিলেন। এখানে অল্প দিনের মধ্যেই ডাঃ রবার্ট কগ্ হিল প্রথমে দেখালেন যে, বিশেষ অবস্থায় মাধ্যমের মধ্যে পেনিসিলিনের উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল-এর চিকিৎসা-গবেষণা সমিতির তত্ত্বাবধানে ডাঃ এ.এন. রিচার্ডস রাসায়নিক পরীক্ষায় এবং

ডাঃ ডি. এস. কীফার রোগচিকিৎসায় এর উপযোগিতা পর্যবেক্ষণের ভার নিলেন। 1943 সালের গোড়ার দিকে গোয়াডালক্যানাল-এর যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত মার্কিন সেনাদের শরীরে এই বস্তু প্রয়োগ করে বহু কঠিন ক্ষত আরোগ্য করা সম্ভবপর হল। তারপর থেকে সেনাবিভাগের ডাক্তারেরা প্রচুর পরিমাণে এই বস্তু উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে অনুরোধ জানালেন। শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। পূর্বোক্ত নর্দার্ন রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির ফার্মেন্টেসান বিভাগের কর্মী রবার্ট কগ্ হিলের উপরেই এর উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের ভার পড়ল। এ ছাড়া পেন্সিল-ভানিয়া স্টেট কলেজ এবং উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়েও এর উৎপাদন ও বিশোধনের চেষ্টা সুরু হল। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ও স্ট্যানফোর্ড এবং কানাডার টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকতর পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদন করতে পারে এমন ছত্রকের সন্ধান করার ভার দেওয়া হল। লিলি, চার্লস ফিজার, ফন্ হায়ডেন প্রভৃতি কয়েকটি সুবৃহৎ রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কারখানাতেও এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখবার আদেশ এবং সুযোগ দেওয়া হল। গভর্ণমেণ্ট এই সব প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পেনিসিলিনের সমস্তটুকুই নিজে ক্রয় করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

এই বিরাট প্রচেষ্টার মধ্যে ফ্লেমিং-এর প্রাথমিক আবিষ্কার অতি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু পেনিসিলিয়ামের এই শাসক-ক্রিয়া তিনি লক্ষ্য না করলে, বিশেষতঃ এই আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার দিকে সকলের দৃষ্টি বারবার তিনি আকর্ষণ না করলে এ আবিষ্কার হয়তো বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। এ কারণেই সারা পৃথিবী থেকে ফ্লেমিংকে বারবার বহুভাবে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

ক্রমে প্রমাণিত হল যে, বায়ুবাহিত ছত্রকের রেণু এই আবিষ্কারের সূত্রপাত করলেও ভূমিবাসী অন্য বহুবিধ ছত্রক ও জীবাণুই এরূপ শাসক-বস্তুর উৎসস্বরূপ। ওয়াক্‌স্‌ম্যান এই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব জীবাণু কি ভাবে বিভিন্ন শত্রুর ও অবস্থাবিপর্যয়ের হাত থেকে নানা জটিল রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে নিজেদের বংশ রক্ষা করে বাঁচিয়ে রেখেছে, তা ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়। এর মধ্যে অনেকেই যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক বস্তু নিঃসারণ করে আত্মরক্ষা করেছে, এ কথাই বিস্তৃত গবেষণায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল।

শাসকবস্তুর সত্তানির্ণয় ও ছত্রকের পরিবর্ধন

দ্রবণে শাসক-বস্তুর সত্তা প্রমাণ করতে হলে সারযুক্ত কিছু মাটি নিয়ে জলে আলোড়ন করে সেই জলের কিছুটা

বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার উপ্তিক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কতক অংশে লাগানো হয়। সক্রিয় ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া তখন উপ্তিক্ষেত্রে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং তাদের উপনিবেশ-গুলি ধীরে ধীরে উপ্ত ব্যাক্টিরিয়াদের নষ্ট করে গলিয়ে ফেলে। তার ফলে এগুলির চারপাশে কতকটা অংশ বেশ পরিষ্কার স্বচ্ছ এবং জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছত্রকের বৃদ্ধি আরও উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের উপ্তিক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়া বপন করেন। এতে ছত্রকের শাসক-শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ে। মাধ্যমে শাসক-ক্রিয়া প্রমাণের আর এক উপায় হল আগারযুক্ত পোষক ছত্রককে বপন করে তার এক ক্ষুদ্রাংশ ব্যাক্টিরিয়ার উপ্তিক্ষেত্রে স্থাপন করা। আগারে শাসক-বস্তু থাকলে তার চারদিকের মাধ্যম অল্পকালের মধ্যেই স্বচ্ছ এবং জীবাণুশূন্য হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত যে-সব শাসক-নিঃস্রাবী ছত্রক ও ব্যাক্টিরিয়ার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশের বৃদ্ধিকালে বাতাসের, অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ অক্সিজেনের দরকার হয়। তাই এদের বায়ুজীবী বলে। এদের উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ চারিটি উপায় অবলম্বন করা হয়ঃ (1) অনতি-গভীর পাত্রে তরল পোষক-মাধ্যমের উপরে ভাসমান অবস্থায় ছত্রক জন্মানো—এতে ক্রমে মাধ্যমের উপরে সাদা বা রঙীন ঈষৎ শক্ত সরের সৃষ্টি হয়; (2) অগভীর পাত্রে মাধ্যমের তলায় নিমজ্জিত অবস্থায় ছত্রককে বাড়তে দেওয়া; এই প্রক্রিয়ায়

দ্রবণের উপরিভাগ থেকে বাতাস ধীরে ধীরে সঞ্চরণ-ক্রিয়া দ্বারা তলায় পৌঁছে, অথবা ছত্রকের বৃদ্ধির সময় পাত্রকে নাড়াচাড়ার ব্যবস্থা করে বাতাসের সংশ্রব রক্ষা করা হয় ; (3) গভীর পাত্রে মাধ্যমের সর্বাংশে ছত্রককে বাড়তে দেওয়া; এর জন্য পাত্রের নীচে-অবস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র বা নল দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ক্রমাগত বাতাস-চালানোর ব্যবস্থা থাকে ; (4) ভিজা জীবাণুমুক্ত ভূষির উপর ছত্রক জন্মানো ; এ অবস্থায় ভূষির প্রত্যেক কণার গায়েই ছত্রক জন্মে ও বাড়ে। ভূষির স্তরকে পুরু করে সাজিয়ে তার ভিতর দিয়ে বায়ু-চলাচলের কৃত্রিম ব্যবস্থা করলে ছত্রক সহজেই বাড়তে থাকে।

ফ্লেমিং-বর্ণিত ছত্রকের স্পোর (রেণু) সাধারণত জলের উপর ভাসমান অবস্থায় অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয়। এজন্য অগভীর তরল মাধ্যমেই এদের উৎপাদন ও বৃদ্ধি সহজ। প্রথমে আগারে-উৎপন্ন সবুজ রঙের রেণুগুলি জলে ভাসিয়ে সেই জলের অল্প অংশ বোতল বা ফ্লাস্কে কৃত্রিম পোষক-মাধ্যমে বপন করা হয়। তারপর সেগুলোকে উপযুক্ত তাপে রাখলে দুদিনের মধ্যেই মাধ্যমের উপরে পাতলা সাদা সর পড়ে। শীঘ্রই এই সর পুরু হয়ে সবুজ কোঁচকানো চামড়ার মত দেখায়। দশ দিনের পর মাধ্যমের রং হলদে দাঁড়ায় এবং শাসক-বস্তুর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। এর পরে ক্রমে ক্রমে মাধ্যমের উপাদান এবং ছত্রকের উপপ্রজাতি বিশেষ যত্নের সঙ্গে নির্বাচন করে

সার প্রয়োগে শস্য বৃদ্ধির মত শীঘ্রই শাসকের পরিমাণ বহুগুণে বাড়ানো সম্ভবপর হয়।

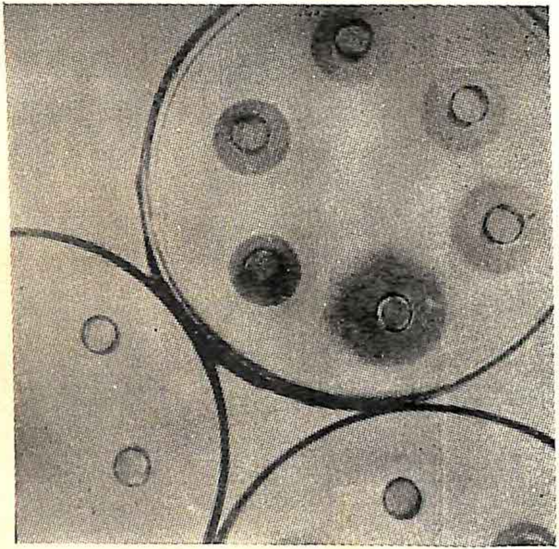
শাসকের শক্তিনির্ণয় ও অক্সফোর্ড-মাত্রা

1940 সাল পর্যন্ত ইংরাজ কর্মীরা তরল মাধ্যমের প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে দুই অক্সফোর্ড-মাত্রা (Oxford unit) পেনিসিলিন উৎপাদন করতে সমর্থ হন। মাধ্যমে কয়েকটি উত্তেজক বস্তু যোগ করার ফলে 1941 সালে এর পরিমাণ প্রথমে 5 গুণ ও পরে 20 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা সুরু হওয়ার কিছু পরে 1942 সালে 'লিলি' কোম্পানির গবেষণাগারে উন্নত ধরণের শক্তিশালী কাল্চার সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। এক বৎসরের মধ্যেই শাসক-উৎপাদনের পরিমাণ 50 হতে 100 গুণ বাড়ে। তারপরে পিওরিয়ার সরকারি গবেষণাগারে আবিষ্কৃত দুইটি উপপ্রজাতি ছত্রক উপযুক্ত মাধ্যমে মৌলিক পেনিসিলিয়াম-এর তুলনায় 150 গুণ শাসক উৎপাদন করতে সমর্থ হল। এর একটির নাম পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম।

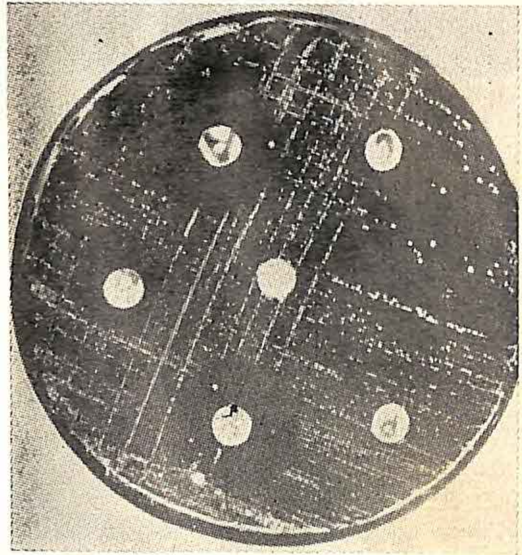
বিভিন্ন জীবাণুর উপরে শাসক-ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য ফ্লেমিং একটি সুন্দর ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। আগারযুক্ত পেট্রি-ডিসে একটি অগভীর সোজা লম্বা খাঁজ কেটে গলানো পেনিসিলিনযুক্ত আগার দিয়ে তিনি তা পূর্ণ করলেন। তারপর বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার

'কাল্‌চার' সরু তার বা কাচ-রডের সাহায্যে তার উপরে রেখার আকারে টেনে লাগিয়ে দিলেন। উপযুক্ত তাপে রাখার পর দেখা গেল যে, শাসকপূর্ণ গর্ত থেকে কিছু দূরে কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার উপনিবেশ বেড়েছে, কিন্তু গর্তের কাছে সেগুলি এগোতে পারে নি। এইভাবে একই পাত্রে এক সঙ্গেই কয়েকটি বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার উপর শাসক-ক্রিয়ার পরীক্ষা সম্ভব হল। শাসক-বস্তুকে শুকনো গুঁড়ার আকারে পাওয়ার আগে পর্যন্ত শাসকযুক্ত কোন মাধ্যমের কার্যকারিতার পরিমাণ জীবাণুতত্ত্বের পরীক্ষা ছাড়া প্রমাণ করার উপায় ছিল না। এজন্য তিনটি উপায় ব্যবহৃত হত। প্রথমটিকে 'পর্যায়ক্রমে বিরলীকরণ', দ্বিতীয়টিকে 'সিলিণ্ডার-কাপ' অথবা 'কাপ-প্লেট' এবং তৃতীয়টিকে 'টার্বিডিমেট্রিক' প্রক্রিয়া বলে। প্রথম পরীক্ষায় শাসকযুক্ত মাধ্যমকে মাংসরস অথবা গলানো আগারের সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় পাতলা (dilute) করা হয়। এই সব পাতলা মাধ্যমের প্রত্যেকটিতে নাশপ্রবণ ব্যাক্টিরিয়া বপন করে যথাসময়ে তাকে উপযুক্ত তাপে রাখা হয়। শাসকের পরিমাণ কম থাকলে জীবাণু নষ্ট না হয়ে বাড়তেই থাকে, তাতে মাধ্যমটি ক্রমে ঘোলা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শাসক-বস্তুর মাত্রা যথেষ্ট থাকলে তা স্বচ্ছ ও পরিষ্কারই থাকে। মাধ্যমে জীবাণুর উপনিবেশ-সংখ্যা শাসক-বস্তুর পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে।

'কাপ-প্লেট' পরীক্ষায় পেট্রি-ডিসে জমানো জীবাণুযুক্ত



ফিল্টার কাগজের চক্রের সাহায্যে—



'সিলিণ্ডার কাপ' প্রক্রিয়ায়—

নাশক-বস্তুর জীবাণুরোধক শক্তি পরীক্ষা

পোষক-মাধ্যমের মাঝে মাঝে ছোট-করে-কাটা কাচের বা অ্যালুমিনিয়মের মুখখোলা নল খাড়াভাবে বসানো হয়। তার পরে সেই নলের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় শাসকযুক্ত পাতলা মাধ্যম ভরে দেওয়ার পরে ডিসগুলিকে উপযুক্ত তাপে রাখা হয়। 12-14 ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে, শাসকের পরিমাণ অনুপাতে নলের ঠিক বাইরের জীবাণু-যুক্ত আগার কম-বেশি পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে নলের বাইরে বিভিন্ন ব্যাসের স্বচ্ছ চক্র-বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। এই সব স্বচ্ছ বেষ্টনীর ব্যাস অতি সাবধানে মেপে শাসকের আপেক্ষিক পরিমাণ স্থির করা যায়। গোল-করে-কাটা ফিল্টার-কাগজ শাসকযুক্ত তরল মাধ্যমে ভিজিয়ে শুকিয়ে রাখলে আরও সহজে এই পরীক্ষা করা চলে। এক্ষেত্রেও শাসকের পরিমাণ অনুসারে এই কাগজের চাকৃতির চারদিকে জীবাণুযুক্ত আগার-মাধ্যম বেশি বা কম ব্যাসের স্বচ্ছ চক্র-বেষ্টনী সৃষ্টি করে। শাসকের পরিমাণ বেশি হলে বেষ্টনীর ব্যাস বেশি ও পরিমাণ কম হলে তার ব্যাস সেই অনুপাতে কম হয়। জীবাণুবিদ হিট্‌লি প্রথমে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন।

তৃতীয় পরীক্ষায় শাসকযুক্ত মাধ্যম এমনভাবে পাতলা করা হয় যে, তা সমস্ত ব্যাক্টিরিয়াকে নষ্ট করতে পারে না। সুতরাং মাধ্যম কিছুটা ঘোলা থেকে যায়। ফটো-ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রে এই অনচ্ছতার পরিমাণ মেপে শাসকের পরিমাণ স্থির করা চলে। কারণ শাসকের পরিমাণ বেশি

হলে তার স্বচ্ছতার বৃদ্ধি হয়, কম হলে স্বচ্ছতাও কমে। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই এই প্রকার পরীক্ষা শেষ করা যায়। সুতরাং অনেক পরীক্ষা অল্প সময়ে করতে হলে এই উপায়টিই গৃহীত হয়।

শাসকের পরিমাণ-নির্ণয়ের জন্য ব্রিটিশ কর্মীরা একটি সর্বজনসম্মত (স্ট্যাণ্ডার্ড) ইউনিট বা একক নির্দিষ্ট করলেন। এর মান বা মাপ হল তাই, যা 50 ঘন-সেন্টিমিটার মাংস-রসে থাকলে স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস নামক জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে। হিট্‌লির 'কাপ-প্লেট' প্রক্রিয়া অনুসারে এই একক দাঁড়ায় সেই পরিমাণ, যা জীবাণুযুক্ত আগার-মাধ্যমে 24 মিলিমিটার (প্রায় এক ইঞ্চি) চওড়া স্বচ্ছ চক্র সৃষ্টি করে। অবস্থার তারতম্যে অবশ্য এই এককের কিছু কম-বেশি হতে পারে। এই কারণে পরে যথাসাধ্য বিশোধিত গুঁড়া পেনিসিলিনকে মাপকাঠি ধরে নূতন পেনিসিলিনের কার্যকরী শক্তি নির্ণয় করা হয়। এইভাবে নির্ধারিত একককে 'ফ্লোরি ইউনিট' বা 'অক্সফোর্ড ইউনিট' (একক) বলে। ফ্লোরি এই নির্দিষ্ট মান বা নির্দিষ্ট শক্তিবিশিষ্ট পেনিসিলিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যান এবং একে অবলম্বন করেই সেখানকার কাজ চলতে থাকে। বর্তমান আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রায় এই মাত্রারই সমান (অতিবিশোধিত সোডিয়াম-পেনিসিলিনের এক মিলিগ্রাম এখন 1667 আন্তর্জাতিক মাত্রার সমান বলে ধরা হয় (3 মিলিগ্রাম = 5000 একক)।

অন্যান্য শাসক-বস্তুর আবিষ্কার

আমাদের পরিচিত অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীই কোন-না-কোন জীবাণু-শাসক বস্তু তৈরি করে ব'লে জানা গেছে। কোন কোন শৈবাল, লাইকেন (ছত্রক ও শৈবালের সমবায়) এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ থেকেও এই প্রকার বস্তু পাওয়া গেছে। প্রাণিজ বস্তুর মধ্যে ডিমের সাদা ও হলদে অংশে, দুধে, এমন কি মুখের লালায় ও চোখের জলেও এরূপ বস্তু অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে। বহু পরীক্ষার ফলে অনেকগুলি বস্তু এইভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর দুটি অণু-উদ্ভিদ থেকে একই শাসক পাওয়া যায়, আবার একই ছত্রক থেকে দুই বা ততোধিক বস্তুও পাওয়া অসম্ভব নয়। পেনিসিলিয়াম থেকে এইভাবে পেনেটিন নামক আর একটি বস্তু পাওয়া গেছে। অ্যাস্‌পারজিলাস ফিউমিগেটাস থেকে ক্লাভেসিন; গ্লাইওটক্সিন এবং ফিউমিগেটিন, আর ব্যাসিলাস ব্রুসী থেকে গ্রামিসিডিন ও টাইরোসিডিন পাওয়া গেছে। এইসব শাসক-বস্তুকে তাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নানা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে।

ছত্রক ও ব্যাক্টিরিয়া এই দুই অণু-উদ্ভিদের মাঝামাঝি পর্যায়ের অ্যাক্‌টিনোমাইসিস্ গোষ্ঠী থেকে দুটি শাসক-বস্তু আবিষ্কার করেন ডাঃ রেনি ডুবস। এদের নাম দেওয়া

হয় স্টে প্টোথিসিন এবং স্টে্পটোমাইসিন। এই দুটি বস্তুর আণবিক গঠন অপেক্ষাকৃত সরল। তরল শোষক-মাধ্যম থেকে সক্রিয় কাঠকয়লার গুঁড়ার সাহায্যে এদের সংগ্রহ করা হয়। হাইড্রোক্লোরিক অম্লের লঘুকৃত দ্রবণের সাহায্যে এদের কাঠকয়লা থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়। দুইটিরই জীবাণু-নাশক শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়টিই অধিকতর কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বর্তমান বই-এর পরিশিষ্টে কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। স্টে প্টোথিসিন-এর বিষনাশকক্রিয়া মৃদু হলেও স্থায়ী, আর স্টে্পটোমাইসিন-এর ক্রিয়া প্রবল এবং দ্রুত। এ্যণ্ট-অ্যামিবা কোলাই, ব্যাসিলাস শীগা এবং স্যাল্‌মোনেলা প্রভৃতি গ্র্যাম-নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়ার উপরেও এর ক্রিয়া আছে, যা পেনিসিলিনের নেই।

ব্যাসিলাস ব্রেভিস নামক ভূমিবাসী অণু-উদ্ভিদ থেকে টাইরোথি্সিন আবিষ্কার করেন রেনি ডুবস। এ থেকে আবার বিশ্লেষণের ফলে তিনি গ্রামিসিডিন এবং টাইরোসিডিন নামক দুটি বিশোধিত বস্তু পান। এ দুটিই পলিপেপ্টাইড পর্যায়ের বস্তু। এই ধরণের বস্তু প্রোটিনের জারণে উৎপন্ন হয়। এদের শক্তিও যথেষ্ট। এক মিলিগ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ এক শত কোটি ব্যাক্টিরিয়া-সম্বলিত দ্রবণকে জীবাণুশূন্য করতে পারে। তবে প্রাণিদেহে বিষক্রিয়া থাকার ফলে চিকিৎসার্থে এগুলির ব্যবহার অসুবিধাজনক; $\frac{1}{5}$ মিলিগ্র্যাম মাত্র

প্রয়োগে একটি ইঁদুর মারা পড়ে। তবে ঘায়ের উপর স্থানীয় প্রয়োগে বেশি অসুবিধা হয় না। রুশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গ্রামিসিডিন-এস নামক আর একটি বস্তুর বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করেছেন। এক উপজাতীয় ব্যাসিলাস ব্রেভিস থেকে একে পাওয়া গেছে। ডুবসের গ্রামিসিডিন থেকে এর রাসায়নিক গঠন এবং ক্রিয়া বিভিন্ন। তবে এর প্রধান গুণ হল তাপসহিষ্ণুতা,—ফুটন্ত জলের উষ্ণতায়ও এ নষ্ট হয় না। গ্র্যাম-নেগেটিভ জীবাণুর উপরেও এর ক্রিয়া আছে। দুষ্ট ক্ষত, চর্মরোগ, অস্থি-বিকৃতি এবং ফুসফুসের কোন কোন রোগে এর ব্যবহারে ফল পাওয়া গেছে।

আরও অনেক শাসক-বস্তুর আবিষ্কার গত দশ বারো বৎসরের মধ্যে ঘটেছে। তার মধ্যে যে-গুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন-সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য জানা গেছে, সংক্ষেপে তাদের কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। পেনিসিলিক অম্ল পেনিসিলিয়াম সাইক্লোপিয়াম থেকে পাওয়া গেছে। শরীরের নানা রসে এর ক্রিয়া নষ্ট হয়। সুতরাং এর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না। অ্যাস্পারজিলাস ক্লাভেটাম নামক ছত্রক থেকে ক্লাভেসিন বা পাটুলিন নামক বস্তু প্রথমে সর্দির ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু বিষক্রিয়া থাকার ফলে শুধু উদ্ভিদের রোগে একে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস নামক ছত্রক থেকে ফিউমিগেটিন এবং পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম থেকে প্রাপ্ত স্পাইলোসিন রঞ্জক-বস্তু।

এরাও বিষক্রিয়ার জন্য ঔষধরূপে অব্যবহার্য। অ্যাস্পারজিলাস ফ্লাভাস থেকে প্রাপ্ত অ্যাস্পারজিলিক অম্লের কতকটা বিষক্রিয়া থাকলেও কোন কোন স্থলে তা প্রযুক্ত হয়েছে।

অ্যাক্টিনোমাইসিস অ্যান্টিবাইওটিকাস নামক ছত্রক থেকে প্রাপ্ত অ্যাক্টিনোমাইসিন-এর সঙ্গে ফিউমিগেটিন-এর কিছুটা রাসায়নিক মিল আছে। টেস্ট্-নলে যক্ষার জীবাণু নষ্ট করতে পারে বলে এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। জানা গেছে যে, এর বিষক্রিয়া ভাইটামিন-সি ব্যবহারে কম হয়। পেনিসিলিয়াম সিট্রিনাম থেকে সিট্রিনিন্ পাওয়া গেছে। এরও বিষক্রিয়া প্রবল। এ ছাড়া গ্লাইওটক্সিন, হেল্ভলিক অম্ল ইত্যাদি আরও অনেকগুলি বিষক্রিয়াযুক্ত শাসক আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবহার বেশি নেই।

সাধারণ রসুন থেকেও অতি সরল একটি গন্ধকঘটিত বস্তু পাওয়া গেছে। পেনিসিলিনের তুলনায় এর শক্তি এক শতাংশ মাত্র, কিন্তু বেশি মাত্রায় প্রয়োগে এরও বিষক্রিয়া আছে।

পেনিসিলিনের গুণ ও ধর্ম

বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন শাসক-বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও ক্রিয়া স্বতন্ত্র। পেনিসিলিনের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, শরীরের বিবিধ সুস্থ তন্তুর উপর তার কোনরূপ

বিষক্রিয়া নেই। এই সব তন্তুর স্বাভাবিক রস বা নিঃস্রাবে অথবা বিভিন্ন ভাইটামিনের ক্রিয়ায় পেনিসিলিন নষ্ট হয় না। ক্ষতের পুঁজ বা অন্যান্য বিকৃত বস্তু, রক্ত-কণিকা, রক্তরস ও রক্তমস্তুর মধ্যেও তা অক্ষুণ্ণ থাকে। সাল্‌ফানিলঅ্যামাইড কিন্তু এ-সবের ভিতরে ভাল কাজ করে না। আবার যে-সব জীবাণু সালফা-পর্যায়ের ঔষধকে প্রতিরোধ করে, তাদের উপরেও এর ক্রিয়া যথেষ্ট। অবশ্য পেনিসিলিনেরও কার্যকারিতার সীমা আছে। রক্তের যে শ্বেত-কণিকাগুলি ক্ষতপূরণ ও তন্তুর পুনর্গঠনে সাহায্য করে, এর ক্রিয়ায় তারাও নষ্ট বা ব্যাহত না হওয়ায় শরীরের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; অবশ্য মাত্রায় যথেষ্ট না হলে প্রবল জীবাণুর পূর্ণ প্রতিরোধ সম্ভব হয় না।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, পেনিসিলিন হল নাইট্রোজেন-ঘটিত অম্লজাতীয় একটি জটিল বস্তু। এর অণুর আয়তন ও ওজন অপেক্ষাকৃত কম। অধিক তাপ ও অম্ল বা ক্ষারের ক্রিয়ায় এবং কতকগুলি রোগজীবাণুর ক্রিয়ায় এ সহজেই নিষ্ক্রিয় হয়। প্রধানতঃ প্রস্রাবের সঙ্গে এবং অল্প পরিমাণে পিত্তের সঙ্গেও শরীর থেকে নিঃসৃত হয় বলে একে ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। প্রস্রাব থেকে আবার একে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কষ্টসাধ্য। পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম ও সোডিয়াম-ঘটিত লবণের আকারে একে ব্যবহার করা যায়। স্থায়িত্ব বেশি বলে

ইংলণ্ডে ক্যাল্‌সিয়াম-ঘটিত লবণই প্রথমে বেশি ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন কোহলের ক্রিয়ায় একে এস্টার-জাতীয় বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, তাদের ক্রিয়া একই রকম।

অম্লের আধিক্যে এ নষ্ট হয় বলে একে মুখ দিয়ে খাওয়ানো চলে না ; কারণ পাকস্থলীতে নিঃসৃত অম্লপাচক রসে এ নষ্ট হয়ে যায়। তবে 'লিলি' কোম্পানির কর্মীরা দেখান যে, কিছু বেশি সোডার সঙ্গে খাওয়ালে এই অসুবিধা দূর হয়। কারণ অম্লপ্রধান পাকস্থলী অতিক্রম করে মৃদু-ক্ষার বিক্রিয়ায় তা ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে কাজ করতে পারে। ইঁদুরের শরীরে এইভাবে তাঁরা স্ট্রেপ্‌টোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস এবং নিউমোককাস-এর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। আবার বাদাম তেল, তুলার বীজের তেল অথবা চর্বির সঙ্গে অবদ্রবভাবে (অর্থাৎ ইমালশান করে) একে প্রয়োগ করলেও এর কতক অংশ অন্ত্রে পৌঁছে উপকার করে।

প্রধানত রক্তনালীতে, পেশীর মধ্যে অথবা চর্মের নীচে সূচিদ্বারা পেনিসিলিন প্রয়োগই উৎকৃষ্ট পন্থা। মেনিন্‌জাইটিস রোগে মেরু-রজ্জুর ঠিক বাইরে অবস্থিত মেরু-নালীতে একে প্রয়োগ করার দরকার হয়। প্রতি ঘণ্টায় 1000 থেকে 5000 মাত্রা পর্যন্ত যাতে শরীরে বর্তমান থাকে চিকিৎসকেরা তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। প্রতি-ঘন সেন্টিমিটার বিশোধিত জলে এক হাজার মাত্রা বা বেশি জলে নিয়ে তার এক থেকে পাঁচ গুণ প্রতি তিন

ঘণ্টা অন্তর স্থচি-প্রয়োগ করা হয়। কঠিন রোগে একই দিনে এক থেকে পাঁচ লক্ষ মাত্রা পর্যন্ত দেওয়ার দরকার হতে পারে। বলা বাহুল্য, ব্যবহারের সময় দ্রবণকে সর্বদাই বরফের মধ্যে ঠাণ্ডা রাখা দরকার, নচেৎ তার শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা। বরফের মত ঠাণ্ডা দ্রবণ স্থচি-প্রয়োগ করলে রোগীর শরীরে বেদনা জন্মে, এবং সেজন্য ছোট ছেলেমেয়েদের চিকিৎসায় কিছু অস্থবিধা হয়।

রক্তের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পেনিসিলিন বজায় রাখতে না পারলে চিকিৎসায় ফল হয় না। রক্তের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ নিয়মিত করার এবং প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গমন নিয়ন্ত্রিত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বেশি পরিমাণ সোডার (সোডিয়াম বাইকার্বনেট) মত কোন মৃত্নক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে পাকস্থলীর পাচকাম্ল রসের ক্রিয়া কতকটা নিবারণ করা যে সম্ভব, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, প্যারা-এমিনো-হিপিউরিক অম্ল পেনিসিলিনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে বৃক্ক-যন্ত্র তাকেই নিঃসারণ করতে ব্যস্ত থাকে। স্থতরাং রক্তে পেনিসিলিনের পরিমাণ অনেকক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে। এতে উপকার বেশী পাওয়া যায়। আবার স্থচিবেধের স্থানটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখলে রক্ত-সঞ্চালন মৃত্ন হওয়ায় এ সহজে ছড়িয়ে পড়ে না। বাদাম তেল ও মোমের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলেও একই ফল

পাওয়া যায়। সম্প্রতি এ বিষয়ে যে আরও উন্নতি করা গিয়েছে, সে সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা যাবে।

বাহ্য-প্রয়োগের জন্য জলে অথবা ভ্যাসেলিন ও জলের মিশ্রণে (ইমালশান) অথবা সাল্‌ফানিলএমাইড ও ম্যাগনেসিয়ার গুঁড়া মিশিয়ে একে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়। বর্তমানে নানারকম মলমের আকারে এর প্রয়োগ চলছে। তবে সাধারণ তাপে ও সাধারণ অবস্থায় এদের গুণ কতটুকু ও কতদিন বজায় থাকে তার খোঁজ রাখা দরকার। বাদাম তেল বা চর্বির মধ্যে অদ্রবন অবস্থায় খাওয়ালে কিছু অংশ পাকস্থলীর অম্ল অতিক্রম করে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে উপকার করতে পারে। তবে এই সকল সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে সূচি-প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়।

পেনিসিলিনের ক্রিয়া

প্রাণিশরীরে বিভিন্ন রোগ-উৎপাদক ব্যাক্টিরিয়াদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর করার জন্য কৃত্রিম রঙের প্রয়োগ দ্বারা তাদের শরীর নীল বা লাল করা হয়। অরঞ্জিত অবস্থায় এই অতিক্ষুদ্র এবং অতিস্বচ্ছ জীবাণুগুলিকে দেখা প্রায় অসম্ভব। ব্যাক্টিরিয়াবিদ গ্র্যাম (Gram) নানা নিপুণ পরীক্ষার ফলে এই অণু-উদ্ভিদগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করেন—গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম নেগেটিভ। এদের প্রথম শ্রেণী নির্দিষ্ট প্রথায় রঞ্জিত হলে 'জেন্‌সিয়ান

ভায়োলেট' নামক বেগুনি রং গ্রহণ করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণী তা করে না। সুতরাং প্রথম শ্রেণীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বেগুনি দেখায়। দেখা গেছে যে, পেনিসিলিন সাধারণত গ্র্যাম-পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়ার উপরেই ক্রিয়াশীল। এগুলির মধ্যে ষ্ট্রেপ্টোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস, নিউমোককাস, গনোককাস ও মেনিন্জোককাস প্রধান। কিন্তু ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি রোগের গ্র্যাম-নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, সিফিলিস ও কুম্ভকর্ণ রোগের প্রোটোজোয়া এবং যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগের অম্লরোধী (acid fast) ব্যাক্টিরিয়ার উপর এর ক্রিয়া নেই বললেই চলে। সুতরাং নানা জাতীয় ফোড়া, ব্রণ, ঘা, রক্তদুষ্টি, টন্সিল-প্রদাহ, ম্যাস্ট্রয়েড গ্রন্থি-প্রদাহ, গ্যাংগ্রিন এবং অস্টিওমায়েলাইটিস নামক কঠিন অস্থিবিকৃতি রোগেও এতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নানাপ্রকার দুষ্ট ক্ষতে বিশেষ সুফল দেখার পরই যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-চিকিৎসকেরা এই বস্তুর প্রচুর প্রস্তুতির জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে বিশেষ তাগিদ আরম্ভ করেন।

প্রোফ্লাভিন, গ্রামিসিডিন, সাল্ফোনেমাইড, জিঙ্ক পারঅক্সাইড ইত্যাদি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যে সকল জীবাণু-নাশক আগে ব্যবহার হত, তাদের তুলনায় পেনিসিলিনের ক্রিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী এবং নিরাপদ। তাছাড়া ঔষধ প্রয়োগের অতি অল্পকাল পরেই এর উপকারিতা

সুরু হয়। কঠিন রোগে মুমূর্ষু রোগীকেও বহুক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার ভিতরে জ্বর, বেদনা ও ব্যাধিক্লেশমুক্ত হতে দেখা গেছে। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই এই সব রোগী চলতে ফিরতে ও কাজ করতে পেরেছে। অবশ্য রোগের প্রাবল্য এবং জটিলতার অনুপাতে এর মাত্রা বেশি বা কম করা হয়। কঠিন অবস্থায় দিনে এক থেকে পাঁচ লক্ষ মাত্রা দরকার হতে পারে ; তবে সাধারণত তিন ঘণ্টা অন্তর তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। রোগের তীব্রতা কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের মাত্রাও কমিয়ে আনা হয়। জ্বর ও যন্ত্রণার লাঘব, রোগীর আরামবোধ, ক্ষুধাবৃদ্ধি ইত্যাদি সুলক্ষণ। তবে খুব তাড়াতাড়ি ঔষধের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়, কারণ রোগজীবাণুর মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র, আর কতকগুলি বিলম্বে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জীবাণুগুলিকে কাবু করতে হলে গোড়া থেকেই বেশী পরিমাণ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, পেনিসিলিন রক্ত থেকে অতি শীঘ্র মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে এবং মূত্রের সঙ্গে শরীর থেকে নির্গত হয়। সুতরাং রোগজীবাণু নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। চিকিৎসাকালে মধ্যে মধ্যে রক্ত পরীক্ষা করে ব্যবহার্য পেনিসিলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। পেনিসিলিন কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে এর অযথা অপচয় বা অপপ্রয়োগ নিবারণ করাই

উচিত। বলা বাহুল্য, জলে গোলার পর সাধারণ তাপেই পেনিসিলিনের গুণ নষ্ট হয়। সুতরাং বরফের মধ্যে এই দ্রবণ ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা দরকার। গুঁড়া অবস্থায় এবং বায়ুশূন্য পাত্রে অবশ্য একে রাখা বর্তমানে সম্পূর্ণ সহজ হয়েছে। পেনিসিলিনের উৎপাদন এবং রক্ষার প্রধান বিঘ্ন এই যে, বেশী তাপ, অম্ল, ক্ষার এবং বহু সাধারণ জীবাণুর ক্রিয়ায় এ সহজেই বিকৃত বা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বাতাসে ভাসমান জীবাণু বা তাদের স্পোর থেকে একে রক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। আবার বিশেষ অবস্থায় পেনিসিলিয়াম ছত্রক নিজেই আর একটি নাশক-বস্তু নিঃসারণ করে। তার নাম পেনেটিন বা নোটেটিন বা পেনিসিডিন বা পেনিসিলিন-বি। এর রাসায়নিক প্রকৃতি পেনিসিলিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি প্রোটিন-জাতীয় জটিল বস্তু। রক্তমস্তু এবং পুঁজের ক্রিয়ায় এ নষ্ট হয়। এর বিষক্রিয়া থাকায় পেনিসিলিন তৈরির সময় একে সাবধানে পরিহার করতে হয়।

পেনিসিলিনের উৎপাদন ও বিশোধন

প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করবার জন্য মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। প্রথমে জীবাণুমুক্ত মাটিতে শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় রক্ষিত বীজ থেকে টেস্ট-নলের মধ্যে রক্ষিত আগারে তৈরি হয় 'কালচার'। তারপরে সেখান থেকে তাকে ভিজা গমের ভূষিতে বপন

করা হয়। ভূষিতে উৎপন্ন বীজ জলে ভাসিয়ে 'বাজুকা' নামক ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তাকে তরল পোষক-মাধ্যমপূর্ণ ছোট ট্যাংক-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে আবার তাকে পাঠানো হয় আরও অনেক বড় ট্যাংক-এ। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়। যাতে কোন অবস্থায়ই কর্মীদের শরীর, হাত, পোষাক অথবা হাওয়া থেকে ধূলা বা জীবাণুর বীজ ট্যাংক-এ ঢুকতে না পারে সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ, পোষক-মাধ্যমের পাত্র, প্রত্যেক উপাদান, এমন কি মাধ্যমের ভিতরে সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত বাতাসকে পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত করার এবং রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। কারখানার প্রত্যেক কর্মীর শরীর বা কাপড়-চোপড় যাতে রোগজীবাণু বহন করতে না পারে এবং যাতে তারা সব সময়ে রোগ-জীবাণুমুক্ত থাকে তার জন্যেও বিস্তৃত ব্যবস্থা রাখা হয়। কারণ আগে বলা হয়েছে যে, কোন কোন রোগজীবাণু বা অন্য সাধারণ জীবাণু পেনিসিলিনকে নষ্ট করতে পারে। সুবৃহৎ ট্যাংক-গুলিতে পেনিসিলিন-উৎপাদন শেষ হলে তাতে ভাসমান ছত্রক-জালকের ঘন পর্দা বা সর (মাইসেলিয়াম) ফিল্টার যন্ত্রে ছেঁকে তরল অংশ পৃথক করা হয়। এই তরল অংশ শোষণ-ট্যাংক-এ স্থানান্তরিত করে যন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত শোষক-বস্তুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নাড়া হয়। তাতে গুঁড়া-

শোষকের মধ্যে পেনিসিলিন আট্‌কা পড়ে। তারপরে ফিল্টার-যন্ত্রে ছেঁকে নিয়ে এই শোষক বস্তুকে অ্যাসিটোন-দ্রাবকে নাড়া হয়। শোষক থেকে তখন পেনিসিলিন বেরিয়ে আসে, কিন্তু কতকগুলি অনাবশ্যক জিনিস আট্‌কা থেকে যায়। দ্রাবককে আবার ভ্যাকুয়াম যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পেনিসিলিন হলদে গুঁড়ার আকারে বেরিয়ে পড়ে। এর পরে তাকে আর একটি জৈব দ্রাবকে গুলে আবার ছাঁকা হয়। তাতেও কতক বাজে জিনিষ বাদ পড়ে। এই দ্রবণকে ঘনীভূত করে পেনিসিলিনকে প্রথমে বেরিয়াম ও পরে সোডিয়াম-ঘটিত লবণে পরিণত করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত গুঁড়া বিশেষ সাবধানে ওজন করে কাচনলে (অ্যাম্পুল) ভরা হয়। এই কাজের সময় টেবিলের উপরে স্টেরি-ল্যাম্প নামক অতি-বেগুনি আলো জালিয়ে রাখা হয়। তার ফলে টেবিলের উপরকার হাওয়ার জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় বলে সেগুলি আর পেনিসিলিনের ক্ষতি করতে পারে না। এত সাবধানে তৈরি জিনিসের মধ্যেও জ্বর-উৎপাদক কোন বিষবস্তু আছে কিনা, গিনিপিগের শরীরে অতিসামান্য পরিমাণ সূচি-প্রয়োগ করে তা দেখা হয়। তাছাড়া গুঁড়ার মধ্যে জলীয় অংশ, বিষবস্তু ও নাশক শক্তির পরিমাণ অতি সুকৌশলে ও সন্তর্পণে নির্ণীত হয়। যে-সব সুবৃহৎ কারখানায় বিরাট যন্ত্রপংক্তিতে এই উৎপাদন ও বিশোধন কার্য সম্পন্ন হয়,

তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। শুধু অতি সংক্ষেপে মোটামুটি একটা আভাস মাত্র দেওয়া হল।

এক আউন্স পেনিসিলিন তৈরি করতে 500 কোয়ার্ট বা $15\frac{1}{2}$ মণ তরল পোষক-মাধ্যম দরকার। সুতরাং কোটি কোটি মাত্রা পেনিসিলিন তৈরি করতে কি পরিমাণ অর্থব্যয় এবং কত যন্ত্রপাতি ও বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তা সহজেই ধারণা করা যায়। 1943 সালে উৎপাদনের প্রথম দিকে 1000 গ্র্যাম (প্রায় এক সের) বস্তু তৈরি করতে 50,000 ডলার ব্যয় হত। 1944 সালের 1লা মার্চ এই প্রস্তুতির পরিমাণ 55 গুণ বেড়ে যায়। উনিশটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে এই কাজ সুরু হয়। এদের মধ্যে ছোট কারখানাগুলিতে মাসে 40 কোটি এবং বড় কারখানাগুলিতে 2000 কোটি মাত্রা পেনিসিলিন তৈরি করা সম্ভবপর হয়। উপরে যে-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তাতে প্রথমে-প্রস্তুত পেনিসিলিনের প্রতি মিলিগ্র্যামে 100-400 অক্সফোর্ড মাত্রা পাওয়া যেত। ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নূতন ধরণের শক্তিশালী ছত্রক ব্যবহারের ফলে পরে প্রতি মিলিগ্র্যামের শক্তি 1667 আন্তর্জাতিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতির পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাওয়াতে দাম কমে গিয়ে সাধারণের সাধ্যের মধ্যে এসেছে।

পেনিসিলিনের নূতন ব্যবহার

আমেরিকার চিকিৎসক-সমিতি প্রমাণ করেছেন যে,

পাস্তুরিত বোতলের দুধ এবং টিনে-রক্ষিত ফল ও তরকারির মধ্যে যে অল্প পরিমাণ বীজাণুর স্পোর (রেণু) থেকে যায়, পাত্র বন্ধ করার ঠিক আগে তার মধ্যে সামান্য পেনিসিলিন দিয়ে রাখলে তারা অবিলম্বেই প্রায় নির্মূল হয়।

গৃহপালিত জন্তুদের চিকিৎসার জন্য এক প্রকার বিশেষ পেনিসিলিন 'লেডারলে' গবেষণাগার থেকে বেরিয়েছে; এর নাম ভেটিসিলিন। ককাস-জাতীয় জীবাণু ও গ্যাস-গ্যাংগ্রিন জীবাণুর ক্রিয়ায় উৎপন্ন নানা রোগে এবং মেষাদির অ্যান্‌থাক্স রোগে এতে প্রচুর উপকার হয়। রুগ্ন পশুদের বিনষ্ট করার নিয়ম থাকাতে যে কোটি কোটি ডলার নষ্ট হত, তা এই ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ করা যাবে, এমন আশা এখন পাওয়া যাচ্ছে। মুখের দাঁতের ও মাড়ির কোন কোন রোগে পেনিসিলিন খুব উপকারী। কালিফর্নিয়ার কলেজ-অব ডেন্‌টিস্ট্রির ডাক্তারেরা দেখিয়েছেন যে, এতে অন্য চিকিৎসার চেয়ে ভাল এবং দ্রুত ফল পাওয়া যায়। দাঁত-তোলার পরের প্রদাহ, মাড়ি-প্রদাহ এবং মুখের কতকগুলি ঘায়ে পেনিসিলিনযুক্ত লজেন্স খেতে দিলে বেশ উপকার হয়; বেদনা, ফোলা এবং জ্বর অতি সহজে অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়।

পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ডাক্তার দেখিয়েছেন, মাতার দেহে সিফিলিস জীবাণ থাকলে যে

মৃতবৎসা রোগ হবার আশঙ্কা থাকে, গর্ভধারণের দশ সপ্তাহের মধ্যে পেনিসিলিনের প্রয়োগে তা রুদ্ধ হয়। আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে আগে যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি হত, তা এখন আর ঘটতে পারে না। নানাজাতীয় মলমের আকারে পেনিসিলিনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে। তবে কিভাবে এর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি এবং কতদিন ঔষধ লাগানো দরকার, তা জানা না থাকলে আনাড়ীর হাতে নানা বিভ্রাট ঘটতে পারে। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ণ মাত্রায় ঔষধের সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়াকে দ্রুত নির্মূল না করলে অনেক রোগজীবাণু ক্রমে পেনিসিলিন প্রতিরোধ করতে সুরু করে। তখন বেশী মাত্রায় ঔষধ দিলেও ফল পাওয়া যায় না। আবার বার বার চর্মের উপর পেনিসিলিন ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে চর্মপ্রদাহ জন্মে। এর ফলে ফুস্কুড়ি, পাঁচড়া বা হামের মত লাল পীড়কার সৃষ্টি হতে পারে।

সম্প্রতি 'পেনিওরাল' নামক একটি নূতন রকমের পেনিসিলিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সূচি-প্রয়োগের দরকার হয় না, খেলেই উপকার পাওয়া যায়। পূর্ণবিশোধিত পেনিসিলিন যে অন্যপ্রকার পেনিসিলিনের চেয়ে বেশি স্থায়ী এবং শক্তিশালী তা সম্প্রতি ভাল করেই প্রমাণিত হয়েছে। পেনিসিলিন-জি নামে দানাদার গুঁড়া বস্তুই আজকাল সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ইনজেক্‌শনের বেদনা

হ্রাস ও পেনিসিলিনের ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে তিন লক্ষ মাত্রা প্রোকেন পেনিসিলিন–জি সহ একলক্ষ মাত্রা সোডিয়াম পেনিসিলিন-জি'র দ্রবণ 24 ঘণ্টা পরপর ইন্‌জেকশন রূপে ব্যবহারেও সুফল পাওয়া যায়। এদের রেফ্রিজারেটর বা শীতযন্ত্রে রাখার দরকার হয় না। অবশ্য জলে গোলার পরে এর আর এই তাপসহিষ্ণুতা থাকে না, তখন দ্রবণকে বরফ জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

পেনিসিলিনের ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি

বিভিন্ন কারখানার মালিকেরা নিজেদের প্রস্তুত পেনিসিলিনের উপযোগিতা এবং বিক্রয় বাড়াবার জন্য নানা আকারে ও নানা নামে উৎপাদন আরম্ভ করেন। ফলে ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। হাঁস, মুরগী ইত্যাদির জন্য বের হল পোল্ট্রি-সিলিন, গবাদি গৃহপালিত পশুর জন্য ভেটিসিলিন বা ডেয়ারিসিলিন, খাবার ঔষধ হিসাবে বের হল পেনিওরাল, দাঁতের রোগের জন্য ডেন্টিসিলিন। 'বাফেলো' কোম্পানি নিজেদের নাম দিয়ে বের করলেন বাফোসিলিন ; এ ছাড়া পেন-ট্রচি, পি.ও.বি. ইত্যাদি আরও অনেক নামে একে চালু করা হল। বর্তমানে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এ-সবের পরিবর্তে সহজবোধ্য কয়েকটি নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। যে-উপায়ে একে প্রয়োগ করা হবে সে উপায়সূচক শব্দের

সঙ্গে 'সিলিন' যোগ করাই বর্তমান রীতি। বাদাম ও তেল মোমের সঙ্গে অবদ্রব রূপে (ইমালশান) 'ফ্লো-সিলিন' নামে এর বিশেষ প্রয়োগ চলছে। এতে তিন ঘণ্টা অন্তর সূচি-প্রয়োগ করা দরকার হয় না। দিনে একবার বা দুদিনে একবার সূচিবেধ করলেই চলে। তেলজাতীয় বস্তুতে থাকার ফলে বেধ-স্থান থেকে এ রক্তে ও নিকটস্থ তন্তুতে সহজে সঞ্চারিত হয় না—ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। সুতরাং ঔষধের ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বেশি হয়। এতে রোগীর ক্লেশ এবং চিকিৎসার ব্যয় কম পড়ে।

এই ধরণের আরও আধুনিক ঔষধের নাম 'সিংগলসট প্রোডাক্ট-এফ'। যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এর আবিষ্কার করেন। বাদাম তেল ও অ্যালুমিনিয়াম স্টিয়ারেট-এর মিশ্রণে অবদ্রব অবস্থায় অর্ধতরল জেলির আকারে একে বেধ-নলে রাখা হয়। এই নলকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেই এ তরল হয়ে যায়, তখন সূচিযন্ত্রে নিয়ে প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয় না। এর প্রধান সুবিধা এই যে, বেধের পরে 96 ঘণ্টা পর্যন্ত ঔষধ বেধ-স্থানে জমা থাকে ও সেখানে থেকে ধীরে ধীরে সারা শরীরে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং চার দিনে মাত্র একবার সূচি-প্রয়োগ করলেই কার্যসিদ্ধি হয়। এর সঙ্গে আবার বেদনানাশক প্রোকেন মিশানো থাকায় বেধের পরে বেদনা হয় না। বলা বাহুল্য ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী এবং রোগী সকলেই এই আকারে ঔষধটি পছন্দ করেন।

পেনিওরাল নামক পেনিসিলিনের বড়ি খাইয়ে গনোরিয়া রোগের আক্রমণ নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে। পেন্টিড্স নামক দুইলক্ষ মাত্রা যথাযথ বিক্রিয়াযুক্ত (বাফারড) পেনি-সিলিন-জি-পটাসিয়াম বড়ি এবং পেন্টিড-সালফাস্ নামক দুইলক্ষ মাত্রা পেনিসিলিন-জি ও 0·5 গ্রাম মেথডিয়া-মার সাল্‌ফোনেমাইড-সমন্বিত বড়িও গলা, মুখ, কান, ফুসফুস প্রভৃতির জীবাণুঘটিত রোগে ও প্রমেহ, রিউ-মেটিক ফিভার প্রভৃতিতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে খাওয়ার-ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সূচিবেধের স্থান ধাতুনির্মিত অ্যাপ্লিকেটর যন্ত্রের সাহায্যে ঠাণ্ডা করলে সূচিবেধের বেদনা কম হয়। প্রোকেনসহ এর ইন্‌জেকসনেও ঐ একই রূপ ফল পাওয়া যায়।

পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের প্রচুর স্তুতির সম্বন্ধে কিছু আভাস আগে দেওয়া হয়েছে। অল্প কয়েক বৎসর আগে যা শুধু গবেষণার বিষয় ছিল, বর্তমানে তা বিশেষ লাভজনক বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। 1948 সালে 16 কোটি ডলার (50 কোটি টাকা) মূল্যের পেনিসিলিন তৈরি হয়েছে। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন যক্ষ্মারোগে কার্যকরী কিনা তাই প্রমাণ করতে বহু বৎসরব্যাপী বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে এবং লক্ষ ডলার মূল্যের ঔষধ ব্যয় করা হয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীর এ-ধরণের বস্তু উৎপাদনে হাত দেওয়ার আশা সুদূরপরাহত। সম্প্রতি ভারত সরকার বোম্বাই-এর নিকটবর্তী পীম্পড়ি নামক স্থানে

পেনিসিলিন তৈরীর একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করেছেন। সেখানে তৈরী পেনিসিলিন সব রকম পরীক্ষার ফলে বিদেশী ঔষধের সম্পূর্ণ সমকক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই বস্তু এখন ভারতের নানা সহরে বিক্রীত হচ্ছে। এরই সঙ্গে সাল্‌ফা পর্যায়ের বিভিন্ন কৃত্রিম ঔষধ এবং স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রস্তুতের কারখানাও শীঘ্রই চালু হবে। এর ফলে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান ঔষধের জন্য আমাদের আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।



ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারক
ডাঃ সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন

আবিষ্কার

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন-এর আবিষ্কর্তা সেলমান ওয়াক্‌স-ম্যানের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 1910 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং রাট্‌গারস বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস্‌সি, এবং কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ্‌ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। অণু-উদ্ভিদ ও অণু-প্রাণীদের ক্রিয়ায় মাটিতে যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ছাত্র-অবস্থা থেকেই তাঁর মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সব অণু-প্রাণী কি পরিমাণে থাকে, তাও তিনি নির্ধারণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, অনেক রোগের জীবাণু মাটিতে বাড়তে পারে না, বরং মাটিতে পড়লে তারা নষ্ট হয়ে যায়। গ্যাস-গ্যাংগ্রিন এবং ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁর ছাত্র রেনি ডুবস রক্‌ফেলার ইনস্টিটিউট-ফর-মেডিক্যাল-রিসার্চ-এ কাজ করার সময় প্রথমে সন্দেহ করেন যে, মাটিতে এমন বস্তু আছে যা স্ট্রেপ্‌টোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস ও নিউমোককাস জীবাণু নষ্ট করতে পারে। সুনিপুণ পরীক্ষার ফলে তিনি ভূমিবাসী একটি জীবাণু থেকে নিঃসৃত 'টাইরোথ্রিসিন নামক একটি রাসায়নিক বস্তু উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

প্রাণি-শরীরে বিষক্রিয়া থাকায় চিকিৎসায় এ-বস্তুকে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি, তবে মূত্রাশয়ের প্রদাহে, পুরাতন দূষিত ফোড়া ও বহুমুখী ফোড়াতে (কার্বাংক্ল) একে প্রয়োগ করে বেশ উপকার পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে অক্সফোর্ড সহরে অধ্যাপক ফ্লোরি ফ্লেমিং-আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের চর্চায় আবার মন দিলেন। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের সমবেত চেষ্টা যে সে-সময়ে তেমন সফল হয়নি, তা আগেই বলা হয়েছে। তবে সকল দেশেই জীবাণুবিদেরা এই জাতীয় শাসক-বস্তুর উৎপাদনে গভীর মনোযোগ দেন। ওয়াক্‌সম্যানও আটজন সহকর্মীকে নিয়ে এই কাজে লেগে যান। কোন ভূমিবাসী বা মৃৎ-জীবাণুর রোগবীজশাসকশক্তি পরীক্ষার জন্য সে-সময়ে তিনটি প্রক্রিয়ার ব্যবহার হত। (1) প্রথম উপায়, ডুবস-আবিষ্কৃত ঘনীকরণ প্রক্রিয়া। এতে কোন রোগ-জীবাণুর 'কালচার' প্রতিদিন টবের মাটির মধ্যে ফেলা হয়। ভূমিবাসী শত্রুরা অবিলম্বে এই জীবাণুদের দমন করার জন্য শাসক-বস্তু প্রস্তুত করতে থাকে। কালক্রমে যথেষ্ট পরিমাণ শাসক জমা হলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। (2) দ্বিতীয় উপায়, 'সিলিণ্ডার-কাপ' প্রক্রিয়া। এতে রোগজীবাণুর কালচার-এর সঙ্গে ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়ার কালচার অল্প পরিমাণে মিশানো হয়। দমনক্রিয়া লক্ষিত হলে ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়ার জাতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়।

এভাবেই পেনিসিলিনের আবিষ্কার সম্ভব হয়। (3) তৃতীয় উপায়, মটর-পরিমাণ একটু মাটি অনেকটা জলে গুলে সেই জলের সামান্য অংশ পেট্রি-ডিসে জমানো আগার-মাধ্যমে মিশান হয়। ভূমিবাসী জীবাণুদের বৃদ্ধি তখন এক জায়গায় স্তূপাকারে না হয়ে ছোট ছোট স্বতন্ত্র উপনিবেশের আকারে ঘটে। তখন যে উপনিবেশের চারদিকে মাধ্যমের রোগজীবাণু নষ্ট হতে দেখা যায়, তাকেই আলাদা করে নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়।

গোড়া থেকেই ওয়াক্সম্যানের এ-সব চেষ্টা খুব সফল হয়েছিল। তাঁর এক সহকর্মী এইচ. বি. উড্রফ লক্ষ্য করেন যে, অ্যাক্টিনোমাইসিস অ্যান্টিবায়োটিকাস জীবাণু এই কার্যে অদ্ভুত শক্তিশালী। এ থেকে নিঃসৃত শাসক অ্যাক্টিনোমাইসিন নিজ ওজনের 10 কোটি গুণ জলেও নানাপ্রকার সাধারণ এবং রোগসঞ্চারক জীবাণু নষ্ট করতে পারে। রোগ-উৎপাদক কতকগুলি ছত্রকের উপরেও এর ক্রিয়া মন্দ নয়। দুঃখের বিষয়, এ বস্তুরও যথেষ্ট বিষক্রিয়া থাকায় একেও চিকিৎসায় লাগানো গেল না। কিন্তু এতে নিরুৎসাহ না হয়ে ওয়াক্সম্যান এবং অন্যান্য কর্মীরা বিভিন্ন স্থান থেকে পচা পাতা ও পচা গোবর ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরীক্ষায় লেগে গেলেন। বহু নিষ্ফল পরীক্ষার পর অ্যাক্টিনোমাইসিস ল্যাভেন্ডুলি নামক আর

একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে স্ট্রেপ্টোথ্রিসিন আবিষ্কৃত হল। পেনিসিলিনের চেয়ে বেশি সংখ্যক রোগে এ বস্তু উপকারী বলেও প্রমাণ পাওয়া গেল। এমন কি, টাইফয়েড ও আমাশয় রোগে এবং অনেক কঠিন ক্ষতে এর প্রয়োগে উপকার পাওয়া গেল। এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী তৃতীয় একটি বস্তু আবিষ্কার করলেন তাঁর সহকর্মী অ্যালবার্ট স্শুট্স,—এরই নাম ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন। এই সব কারণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রথমে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হলে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রদ ঔষধ বলে প্রচলিত হত।

ষ্ট্রেপ টোমাইসিস গ্রিসিয়াস-এর দুটি উপপ্রজাতি এই কাজে ব্যবহৃত হল। একটি পাওয়া গেল সারযুক্ত জমি থেকে, আর একটি পাওয়া গেল রুগ্ন মুরগীর গলা থেকে। এই নূতন শাসকের শক্তি ষ্ট্রেপ্টোথ্রিসিন-এর চেয়েও বেশি। তাছাড়া এর বিষক্রিয়া নেই বললেই হয় এবং আবশ্যকের বহুগুণ বেশি মাত্রা ব্যবহারেও কোন ক্ষতি দেখা গেল না। যে-সব রোগে পেনিসিলিন অচল, তাদের নিয়ে তখন পরীক্ষা সুরু হল। 'আন্‌ডুলেণ্ট্ ফিভার' নামক কঠিন জ্বরের কোনও ঔষধ আগে জানা ছিল না; এই বস্তু সে-অভাব পূর্ণ করল। পালিত পশুদের শরীরেও এই রোগ 'ব্যাংস (Bang's) ডিজিজ' নামে প্রকাশ পায়। এ রোগে প্রাণি-বিনাশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে

তিন কোটি ডলার লোকসান হত। প্রথমে ডিমের মধ্যে, পরে গিনিপিগের শরীরে এ রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে এই শাসকের উপকারিতা প্রমাণ করা হল। তারপরে প্যারাটাইফয়েড রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের শরীরে একে প্রয়োগ করা হল। ক্রমে 'র‍্যাবিট ফিভার' ও টাইফয়েড রোগেও এতে উপকার পাওয়া গেল। এমন কি, প্রথমে টেস্ট-নলে এবং পরে গিনিপিগের শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু জন্মিয়ে তার উপরেও এর শাসকক্রিয়া দেখা গেল। তবে মানুষের সকল রকম যক্ষ্মারোগে এর উপকারিতা তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়নি, অর্থাৎ যক্ষ্মারোগে একমাত্র এরই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করবার মত অবস্থা তখনও হয়নি।

রাসায়নিক গুণ ও ক্রিয়া

পেনিসিলিন যেমন অম্লজাতীয় বস্তু, স্ট্রেপ্টোমাইসিন তার বিপরীত, অর্থাৎ ক্ষারধর্মী। সুতরাং হাইড্রোক্লোরিক বা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে উৎপন্ন এর লবণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে এ সহজে রক্তে বিশোষিত হয় না। এজন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের রোগে এ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে সচরাচর একে মাংসপেশীতে চর্মের নীচে বা রক্তনালীতে সূচি-প্রয়োগ করা হয়। এ বস্তুও প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু অংশ পিত্তের সঙ্গেও নিঃসৃত হয়। তবে পেনিসিলিনের তুলনায় এ কতকটা ধীরে ধীরে নিঃসৃত হওয়াতে উপকার

বেশি এবং স্থায়ী হয়। রোগচিকিৎসায় এর 10 লক্ষ থেকে 20 লক্ষ মাত্রা প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পরিমাণের কোন বিষক্রিয়া নেই। আগেই বলা হয়েছে, গিনিপিগের যক্ষ্মারোগে এতে উপকার পাওয়া গেছে। মানুষের রোগে কতটুকু স্থায়ী উপকার হয়, তা তখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি। মূত্রযন্ত্রের কতকগুলি কঠিন রোগে, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা-ঘটিত মেনিন্‌জাইটিস রোগে এবং ফুসফুসের ক্ষতে এতে বিশেষ উপকার হয়েছে।

প্রচুর প্রস্তুতি

সাল্‌ফানিলএমাইড এবং পেনিসিলিনের পরেই স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন-এর প্রচুর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিস গ্রিসিয়াস-এর দুটি উপপ্রজাতি থেকে এই বস্তু পাওয়া গিয়েছে। আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এ অতি উচ্চস্থান দখল করে। বিশেষত যুদ্ধের ফলে এ-জাতীয় বস্তুর চাহিদা খুব বাড়ে। 'মার্ক' কোম্পানির বিরাট রাসায়নিক কারখানা এই কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়। 'ওয়ার প্রোডাক-সান্‌স-বোর্ড' এই বস্তুর মূল্য বুঝতে পেরে যাতে এই কোম্পানি অপরের চেয়ে আগে (প্রায়রিটিতে) আবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই উৎপন্ন শাসকের নমুনা দেশের সমস্ত বড় বড় হাঁসপাতালে এবং পরীক্ষাগারে

পাঠান হয়। 1945 সালের জুন মাসে রাওয়ে সহরে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আলোচনায় নির্ধারিত হয় যে, র‍্যাবিট্ ফিভার ও ইনফ্লুয়েঞ্জা-ঘটিত মেনিন্‌জাইটিস নামক দুই প্রকার গ্র্যাম-নেগেটিভ-জীবাণুঘটিত রোগ ছাড়া অনেক রকম গ্র্যাম-পজিটিভ-জীবাণুঘটিত রোগেও এ বস্তু বিশেষ শক্তিশালী। কোন কোন জাতের যক্ষ্মারোগেও এর উপকারিতা স্বীকৃত হল। নৌ এবং সেনা বিভাগ এই বস্তুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট আরও দুটি কোম্পানিকে এর প্রস্তুতির ভার দিলেন। রসায়নবিদ্, শারীরতত্ত্ববিদ্ এবং ইঞ্জিনিয়ারগণের সমবেত চেষ্টায় স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন তৈরির অতি উৎকৃষ্ট পন্থা শীঘ্রই আবিষ্কৃত হল।

এই বিরাট প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত শুনলে অবাক হতে হয়। প্রথম প্রস্তুতির জন্য যন্ত্রপাতির মোট ব্যয়ই হল 35 লক্ষ ডলার। এক্‌টন সহরে তিনটি এবং রাওয়ে সহরে একটি বিরাট বাড়িতে এই যন্ত্রাবলী সাজান হল। 1950 সালে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ গ্র্যাম (প্রায় 220 পাউণ্ড পরিমাণ) শাসক এই কারখানাসমষ্টিতে তৈরি হয়। উৎপাদন বর্তমানে আরও বহুগুণ বেড়েছে। এই উৎপাদন চালু করার জন্য 50 হাজার টন কাঁচামাল এবং $4\frac{1}{2}$ কোটি গ্যালন জল ব্যবহার করা হয়। আর কোন রকম রাসায়নিক কারখানাতেই এত সামান্য পরিমাণ উপজাত দ্রব্য পাওয়ার জন্য এত বেশি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় নাই।

প্রধানত পর পর চারিটি প্রক্রিয়া এই উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে ছত্রকের সাহায্যে পোষক-মাধ্যমে সন্ধান (fermentation), দ্বিতীয়ত মাধ্যম থেকে শাসক-বস্তুকে শোষকের সাহায্যে উদ্ধার, তৃতীয়ত তার বিশোধন এবং চতুর্থত তাকে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আনা ও তার বিশুদ্ধিকরণ ও শক্তিপরীক্ষা। পোষক-মাধ্যমে শতকরা এক ভাগ গ্লুকোজ, ½ ভাগ পেপ্‌টোন, ½ ভাগ মাংসরস, আর ½ ভাগ সাধারণ লবণ থাকে। এসব পরিমাণের সামান্য অদলবদল করলে বা তাপ ও অম্লের মাত্রা বেশি হলে উৎপাদনের ক্ষতি হয়। মাংসরসের বদলে ভুট্টা-ভিজানো জল ব্যবহার করা চলে, তাতে খরচ কম হলেও বিশোধন কার্য কঠিন হয়। আবার গ্লুকোজের বদলে শ্বেতসার কিংবা গ্লিসারিন এবং পেপ্‌টোনের বদলে অ্যামিনো-অ্যাসিড অথবা ট্রিপ্‌টোন (জারিত প্রোটিন—প্রোটিনের উপর অগ্ন্যাশয়জাত ট্রিপ্‌সিন জারকের ক্রিয়ায় উৎপন্ন) অথবা সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রথমে কাঁচামালগুলি বিশগুণ জলে মিশিয়ে বিশেষ পাত্রে জমা রাখা হয়। তা থেকে আবশ্যকমত পাম্প করে সন্ধান পাত্রে (ফার্মেণ্টার—যেখানে ছত্রক জন্মানো হবে) পাঠিয়ে 120° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। পাত্রটিকে ঠাণ্ডা করে 25°-10° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এনে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন-এর বীজ বপন করে 10°-25° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রক্ষা করলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে

মাধ্যমে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন উৎপন্ন করে। মাধ্যম সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না থাকলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ অনেক কম হয়, অথবা বিশোধন-ক্রিয়া কঠিন হয়ে উঠে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য পাত্রের নল, জোড়, পাম্প, ভাল্‌ভ ইত্যাদির বাইরেটা বাষ্প (ষ্টিম) দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। আবার ওয়াক্‌সম্যানের মৌলিক ছত্রকের কালচার-এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বীজ নিয়ে এই বপনকার্য নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই বীজ জীবাণুমুক্ত মৃত্তিকার মাধ্যমে বরফের ঠাণ্ডায় রাখা থাকে। তার 1/10 গ্র্যাম পরিমাণ প্রথমে গলিত আগারে বপন করে উপযুক্ত উষ্ণতায় রেখে তাকে অঙ্কুরিত করা হয়। তারপর বিশুদ্ধ জলে পাতলা করে তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশ আবার 300 ঘন-সেন্টিমিটার পোষকযুক্ত পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে নিমজ্জিত অবস্থায় তা বাড়তে থাকে। পাত্রগুলি যন্ত্রের সাহায্যে নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা থাকায় বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয় না। ছত্রকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম ক্রমে ক্ষারধর্মী হয়ে ওঠে। টেস্ট-নল থেকে ফ্লাস্কে এবং ফ্লাস্ক থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে বড় চার রকম সাইজের ইস্পাতের পাত্রে এই কালচার স্থানান্তরিত করা হয়। এতে মাধ্যমের পরিমাণের অনুপাতে ছত্রক-জালকের পরিমাণ ঠিক থাকে বলে নাশক-বস্তুর উৎপাদন বেশি হয়। প্রত্যেক পাত্রে উৎপাদনের অনুপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি একই রূপ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে

স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি কাজ মিলিয়ে সময় লাগে কয়েক দিন মাত্র। পাত্রের মধ্যস্থিত পাইপের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল চালিয়ে মাধ্যমকে 25°-30° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করার পর মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অতি সাবধানে বিশোধিত বাতাস চালানো হয়। প্রতি গ্যালনের ভিতর মিনিটে 1/30 ঘন-ফুট বাতাস দেওয়া হয়। এই বাতাস এবং সন্ধানে-উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জন্য তরল-মাধ্যমে ফেনা ওঠে। বাতাসের পরিমাণ ঠিক রাখতে না পারলে ফেনা বেশী হয়ে কাজের অসুবিধা ঘটায়, আবার বাতাস কম হলে শাসকের পরিমাণ কম হয়। 15 হাজার গ্যালন তরল-মাধ্যম থেকে অতি অল্প পরিমাণ শাসক পাওয়া যায়। তাও অতি সামান্য কারণেই নষ্ট হতে পারে। আবার কাজের যে-কোন অবস্থায় তিল-পরিমাণ রোগজীবাণু মাধ্যমে ঢুকেছে জানতে পারলে সবটা মাধ্যম ফেলে দিতে হয়, কারণ ঔষধটি তখন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সন্ধানক্রিয়ার পরে ছত্রকের জালক বা সূতালি বিশেষ ফিল্‌টার যন্ত্রে ছাঁকা হয়। তারপর পরিষ্কার তরল অংশ থেকে শাসকের বিশোধিত গুঁড়া কাঠকয়লার সাহায্যে শোষণ করা হয়। এই কাঠ-কয়লাকে জলীয় অংশ থেকে আবার ছেঁকে ফেলা হয়। দু-বারই ফিল্‌টার করার সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের ফলে তিলমাত্র শাসক লোকসান হয় না। বহু গবেষণার ফলে এ-সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট

করা হয়েছে। 'কন্টিনিউয়াস-প্রেসার ফিল্টার' নামক যন্ত্র ছাঁকনির কাজ করে। মাধ্যমের পরিমাণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ শোষক-বস্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আপনিই মাধ্যমে এসে পড়ে। কম হলে শাসকের সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় না, আর বেশি হলে কতক শাসক শোষক বস্তুতে আট্‌কা পড়ে যায়। কাঠকয়লার গাদকে পরে কোহলের মধ্যে গুলে তাকে আবার ছাঁকা হয়। এতে অনেক বাজে জিনিস কয়লার মধ্য হতে বাদ পড়ে যায় এই দ্রবণ থেকে তারপরে 'কোয়াড্রুপ্‌ল-এফেক্ট ইভাপোরেটর' নামক যন্ত্রের সাহায্যে অতি শীঘ্র দ্রাবককে পুনরুদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাসক-বস্তুযুক্ত কয়লা শুকনো গুঁড়ায় পরিণত হয়ে যায়, তা থেকে কোহলযুক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে শাসককে নিষ্কাশিত করা হয়। 'টু-স্টেজ কাউন্টার কারেণ্ট' নামক নিঃসারণ প্রক্রিয়ায় এই কাজ নিষ্পন্ন হয়। তাতে শাসক বেরিয়ে আসে, আর অনেক বাজে জিনিস কয়লায় আট্‌কা পড়ে থাকে। তারপর ক্ষারের দ্বারা এই অম্লত্ব নষ্ট করে ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাহায্যে তাকে ঘন করা হয়। এই ভাবে যে গুঁড়া পাওয়া যায়, তাতে শতকরা 24 ভাগ মাত্র শাসক থাকে। সুতরাং আর একটি বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে অকেজো জিনিস বাদ দিয়ে শাসককে আবার উদ্ধার করতে হয়। এইভাবে বিশোধনের পর চিনামাটির (ব্যাক্টিরিয়া ছাঁক্‌বার) ফিল্টার যন্ত্রে ছাঁকলে দ্রবণটি রোগজীবাণুমুক্ত হয়।

তারপর ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে শুকিয়ে মরচে-ধরে-না-এমন (স্টেন্‌লেস) স্টিলের ড্রামে বন্ধ করে তাকে রাওয়ে সহরে পাঠান হয়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় জীবাণু-দুষ্টি নিবারণের জন্য যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, এখানকার কারখানায় তার চেয়েও বেশী সাবধানে কাজ চলে। প্রত্যেক কর্মীকে কারখানায় ঢোকা মাত্র বাইরের জামা-কাপড় জুতা ছেড়ে জীবাণুমুক্ত পোষাক পরতে হয়। তারা যাতে কোনভাবে রোগজীবাণু বহন করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ দৃষ্টি ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। পরিশেষে অত্যন্ত সাবধানে ড্রাম থেকে শাসককে ছোট ছোট কাচ-নলে ভরা হয়। 'স্টেরি ল্যাম্প'-এর আলোকে এবং কণায়িত মেথিলিন গ্লাইকল বাষ্পের মধ্যে কাজ করায় ঘরের বাতাসের সমস্ত জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় এবং কাচনলে কোন জীবিত রোগজীবাণু ঢুকতে পারে না। এত সাবধানে শাসক নলে ভরার পরেও তার কয়েকটিকে নিয়ে আবার পরীক্ষা করা হয়, এর মধ্যে পাইরোজেন বা জ্বর-উৎপাদক বস্তু, কিংবা রক্তের চাপ বৃদ্ধিকর কোন বস্তু আছে কিনা, অথবা এর কার্যকারী শক্তিই বা কতখানি?

কারখানায় তৈরি শাসকপূর্ণ কাচনলের প্রত্যেকটির সঠিক হিসাব রাখা হয়। একটি নলও কম হলে সকল কর্মচারীকে আটকে রেখে নলটির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। কারণ, কোম্পানি প্রত্যেক নলস্থিত গুঁড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখতে

চান। যার ইতিহাস নির্দোষ নয়, অর্থাৎ কি অবস্থায় সেটি তৈরি হয়েছে তা জানা নেই, তাকে বাজারে ছাড়া হয় না। কারণ একটি নলেও জীবাণু দুষ্ট বা নষ্ট বস্তু থাকলে শুধু যে রোগীর ক্ষতি হবে তা নয়, শাসক-বস্তুর এবং নির্মাতারও দুর্নাম হওয়ার সম্ভাবনা। প্রত্যেক কাচনলে সাধারণত এক গ্র্যাম (15 গ্রেন) ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন থাকে। কাচনলগুলিকে এমন আধারে রাখা হয়, যার উষ্ণতা 15° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের নীচে থাকে ; নচেৎ ঔষধের কার্যকরী শক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। 1946 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অসামরিক প্রয়োজনেও এই শাসকের বিতরণ আরম্ভ হয়েছে। কারখানার মালিকেরা এই উদ্দেশ্যে প্রায় 10 লক্ষ ডলার ব্যয় করেছেন। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দামই দুই লক্ষ ডলার। এক্‌টন সহরে 50-60 জন সুদক্ষ কর্মী এই কাজের প্রতিটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রতিদিন শত শত নলের শাসক-বস্তু নিয়ে অতি সাবধানে পরীক্ষা করে দেখা হোত।

ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন পেনিসিলিনের মতই সূচি-প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, তবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্রিয়ার দরুণ অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া দরকার। পেনিসিলিনের মত এর ব্যবহারের সময়েও কতকগুলি রোগজীবাণু প্রতিরোধ-

শক্তি অর্জন করে বলে কিছু অসুবিধা হতে পারে; তাই গোড়াতেই ঔষধের পরিমাণ বেশী দিতে হয়। এতে কোন কোন রোগীর চর্মে ফোলা, বেদনা, পীড়কা ইত্যাদি স্থানীয় উপসর্গ দেখা দেয়। বেশি দিন ও বেশি মাত্রা প্রয়োগে চর্মে হামের মত পীড়কা এবং মূত্রযন্ত্রে প্রদাহের সৃষ্টি হতে পারে। সব রকম যক্ষ্মারোগে এতে উপকার হয় না। অনুকূল ক্ষেত্রেও দিনে এক বা আধ গ্র্যাম মাত্রায় এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত দৈনিক দুই বার প্রয়োগ করতে হয়। জীবাণুর কতক অংশ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করে বলে চিকিৎসার গোড়ার দিকে যেমন ফল পাওয়া যায়, পরের দিকে আর তেমন হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগের পুনঃপ্রকোপ দেখা দেয়। তখন আর এতে কোন উপকার হয় না। এর দামও যথেষ্ট, তাই এভাবে চিকিৎসা খুবই ব্যয়সাধ্য। তবে পেনিসিলিন ও সাল্‌ফা-পর্যায়ের ঔষধে কাজ হয় না এমন কতকগুলি রোগে কার্যকরী বলে এর ব্যবহার এখনও যথেষ্ট চলছে। মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন নবাবিষ্কৃত শাসকবস্তু এর স্থান দখল করবে। এগুলির কথা পরিশিষ্টে উল্লিখিত হল।

যক্ষারোগে এর ব্যবহারে নিশ্চিত ও স্থায়ী উপকার কতটুকু হয়, তা নিয়ে এখনও তর্কের শেষ হয়নি। যক্ষ্মা দীর্ঘস্থায়ী রোগ বলে দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ছাড়া উপায় নেই। তবে এর প্রয়োগে গোড়ার দিকে জ্বর ও কাশির কতক উপশম, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ওজনবৃদ্ধি এবং রোগীর সুস্থতা-

বোধ হয় বলে এর ব্যবহারে যথেষ্ট সার্থকতা আছে। তাছাড়া এর চেয়ে নির্দোষ এবং নিঃসংশয়ে উপকারী বস্তুর আবিষ্কার, প্রস্তুতি ও প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত মন্দের ভাল হিসাবে একে ছাড়া চলে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের অণুতে হাইড্রোজেন যোগ করে ডাই-হাইড্রোষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রস্তুত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এলি লিলি কোম্পানি এই রাসায়নিক বস্তু তৈরী ও পরীক্ষা করেন। মূল ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের তুলনায় এর বিষক্রিয়া কম বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষতঃ প্রজননেন্দ্রিয়ের উপরে এর অনিষ্টকারিতা অনেক কম। এর মাত্রা আদি বস্তুরই মত এবং সূচিপ্রয়োগেই এর প্রধান ব্যবহার। প্রয়োগের পরে বিভিন্ন তন্তুতে এর সঞ্চারণ ও শরীর থেকে এর নির্গমন ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনেরই মত। দুই থেকে চার মাস পর্যন্ত একে প্রয়োগ করা চলে। দিনে পূর্ণ মাত্রায় একবার বা অর্ধমাত্রায় দুইবার প্রয়োগই ফলদায়ক হয়ে থাকে।

পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সমবায়ে তৈরি ‘কম্‌বায়োটিক’ নামক ঔষধ ব্যবহার করে ব্যাক্টিরিয়া-ঘটিত অনেক রোগে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি পেনিসিলিনের সঙ্গে সাল্‌ফা-জাতীয় ঔষধ অথবা অন্যান্য নাশক বস্তু (এদের কথা পরিশিষ্টে বলা হয়েছে) ব্যবহার করেও নানা কঠিন রোগ নিরাময় করা গেছে। কোন কোন রোগজীবাণু কিছুদিন শরীরে

অবস্থানের পরে ব্যবহৃত নাশক বস্তুকে প্রতিরোধ করতে সুরু করে। তখন আর এই নাশক ব্যবহারে বিশেষ কোন কাজ হয় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে আর কোন নাশক-বস্তু শরীরে উপস্থিত থাকলে এই অসুবিধা ঘটতে পারে না। তা ছাড়া একটি নাশক অন্য নাশকের শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন নাশকের এরূপ সহযোগকে 'সিনার্জিসম্‌ (synergism) বলে।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় সম্প্রতি এরূপ নাশকবস্তু ছাড়াও কয়েকটি কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মধ্যে প্যারা-এমিনো-স্যালিসিলিক এসিড (যাকে সংক্ষেপে P.A.S. বলে), আইসোনিকোটিনিক হাইড্রেজাইড,) nydrazide) এবং এসিট্যামাইনোবেন্‌জাল্ডিহাইড থায়োসেমিকার্বাজোন (সংক্ষেপে tibione) প্রধান। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে একটিকে ব্যবহার করলে যক্ষ্মাজীবাণুর নাশকবিরোধীশক্তি সহজে জন্মে না। তাছাড়া রোগের প্রাবল্যও অনেকটা কম হয়। এই রাসায়নিক বস্তুগুলির বিষক্রিয়া অল্প এবং দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায় এদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে।

পরিশিষ্ট

আধুনিক আবিষ্কার

পুর্বেই বলা হয়েছে যে, পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগে ও পরে অন্যান্য শক্তিশালী শাসকবস্তু প্রস্তুত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় 40টির অধিক শাসকবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকগুলি ছত্রক ও অণু-ছত্রক থেকে ও বাকি অর্ধেক ব্যাক্টিরিয়া থেকে পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকটি নিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর উপর এবং সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। তার ফলে অধিকাংশই বিষক্রিয়া এবং অন্যান্য দোষের জন্য বর্জিত হয়েছে। গত চার-পাঁচ বৎসরে যেগুলি আশাজনক ফল দিয়েছে, তাদের কয়েকটির কথা নীচে উল্লেখ করা গেল।

ইংলণ্ডে ওয়েলকাম-ফিজিওলজিক্যাল-রিসার্চ-ল্যাবরেটরিতে আইন্‌সওয়ার্থ, ব্রাউন এবং ব্রাউনলি একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে 'এয়ারোস্পোরিন' নামক একটি শাসকবস্তু উদ্ধার করেন। ডাঃ সুইফ্‌ট এর উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ছেলেদের হুপিংকাশি রোগে (যে রোগের ভাল ঔষধ আগে জানা ছিল না) এবং টাইফয়েড রোগে এতে সুফল পাওয়া যায়। পেনিসিলিন এ-দুটি রোগে কোন ফলই দেয় না।

আর একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার) রসায়নবিদ্ বেনেডিক এবং লংটাইক 'পলিমিক্সিন' নামক একটি শাসক বস্তু তৈরী করেছেন। ডাঃ সোইনবাক, ব্রে, বিশ এবং লং এ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, অনেক গ্র্যাম-নেগেটিভ জীবাণুর উপর এর ক্রিয়া আছে। এর মধ্যে আমাশয়, মেনিন্‌জাইটিস, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ছাড়া ভাইরাস-ঘটিত র‍্যাবিট-ফিভার এবং আন্‌ডুলেণ্ট-ফিভার নামক কঠিন রোগেও এর প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু যক্ষ্মারোগে এতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়নি।

মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ কয়েল 1945 সালে ব্যাসিট্রেসিন নিয়ে পরীক্ষা করেন। গলা ও ফুস্‌ফুসের রোগে এতে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। অস্ত্রোপচারের পরে পুরাতন ক্ষতে, ফোড়া ও ঘায়ে এবং সিফিলিস রোগে এতে উপকার দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ মেলেনি এ-বস্তু প্রথমে প্রস্তুত করেন। সূচি-প্রয়োগের পক্ষে ভাল না হলেও কাটা, ফোড়া, ঘা, ব্রণ, চোখওঠা ইত্যাদিতে বাহ্য-প্রয়োগ করে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গেছে। বর্তমানে এর প্রচুর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। লজেন্সের আকারে মুখের ও গলার রোগে এর ব্যবহার আরামদায়ক।

ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাস সহরের উপকণ্ঠে একটি চাষের ক্ষেতের মাটি থেকে ডাঃ বার্কহোলডার ও তার চারজন সহকর্মী 'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ভেনিজুয়েলি'

নামক অণুছত্রাক ও তা থেকে 'ক্লোরোমাইসেটিন' নামক একটি বিশোধিত এবং কেলাসিত নাশকবস্তু প্রস্তুত করেন। পার্ক ডেভিস নামক যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ ঔষধ-কারখানায় এর প্রস্তুতি সম্ভব হয়। তারপর শীঘ্রই এর রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে একে প্রস্তুত করার উপায়ও আবিষ্কৃত হয়। অনেকগুলি 'গ্র্যাম-পজিটিভ' ও 'গ্র্যাম-নেগেটিভ' ব্যাক্টিরিয়ার উপর এর ক্রিয়া দ্রুত ও প্রবল। এর প্রধান সুবিধা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ-বস্তু সূচিপ্রয়োগ করতে হয় না; খাওয়ালে পাকস্থলি থেকে সহজেই রক্তে নীত হয়ে বিভিন্ন তন্তুতে প্রবেশ করে। তা ছাড়া প্রাণীশরীরে এর বিষক্রিয়া নেই বল্লেই চলে। উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগে অনেক মুমূর্ষু রোগীকেও এর প্রয়োগে জ্বর, বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ থেকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ব্যাসিলাস ও ককাস জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া-ঘটিত বিভিন্ন সাধারণ রোগ ছাড়াও মূত্রাশয় ও মূত্রগ্রন্থির নানা কঠিন রোগে (যেখানে পেনিসিলিনের উপযোগিতা কম) এর ব্যবহার আছে। এমিবা-ঘটিত আমাশয়েও এতে উপকার হয়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কঠিন টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড রোগে এবং শীতপ্রধান দেশের টাইফাস রোগে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তা ছাড়া

র‍্যাবিট-ফিভার, প্যারট-ফিভার ও ভাইরাস-ঘটিত কয়েকটি কঠিন রোগেও এর ব্যবহার আছে।

সাধারণতঃ রোগের প্রাবল্য অনুসারে এর মাত্রা কম বা বেশী করা হয়। রোগের প্রকোপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এর মাত্রাও কমিয়ে আনা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু-তিন দিনের মধ্যেই এতে যথেষ্ট উপকার দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতি সম্ভব হওয়ায় এর দামও আগেকার তুলনায় অনেক কমে গেছে। এর আণবিক গঠনও অন্যান্য শাসকবস্তুর তুলনায় অনেকটা সরল। কতকগুলি অসাধারণ পরমাণুগুচ্ছ (atomic groups) থাকার ফলে ক্লোরোমাই-সেটিনের রাসায়নিক গঠনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এরূপ নানা সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে।

নোবেল পুরস্কার-জয়ী ডাঃ ডয়েসি 'অ্যাস্‌পারজিলাস ফিউমিগেটাস' ছত্রক থেকে ফিউমিগেটিন নামক নাশক বস্তু প্রস্তুত করেছেন। যক্ষ্মায় এর উপকারিতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনরোধী জীবাণুকেও এ নষ্ট করে। দধি-উৎপাদক অতিক্ষুদ্র বেসিলাস জীবাণু থেকে নাইসিন তৈরি করছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা। যক্ষ্মায় এর উপকারিতা নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত লেডারলে কোম্পানির ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় ডাঃ বি. এম. ডাগার 1948 সালে কয়েকজন সহকর্মীর সহযোগিতায় স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন

অরিওফাসিয়েন্স নামক একটি নোমাইসিন গোষ্টীর এক প্রকার অনুছত্রাক থেকে একটি হলদে রঙের কেলাসিত নাশক বস্তু উদ্ধার করেন। প্রায় 50 রকম জীবাণুর উপর বিস্তৃত পরীক্ষার পরে 'গ্র্যাম-পজিটিভ' ও 'গ্র্যাম-নেগেটিভ' উভয় রোগ-জীবাণুর উপর এর প্রবল ক্রিয়া প্রমাণিত হয়। পেনিসিলিনরোধী কতকগুলি জীবাণুর উপর এর প্রবল ক্রিয়া থাকায় এর উপযোগিতা যথেষ্ট বেশী। এমিবা-ঘটিত আমাশয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারট-ফিভার, হুপিং-কাশি, নানা প্রকারের নিউমোনিয়া, টাইফাস, জরায়ু রোগ এবং ভাইরাস-ঘটিত কয়েকটি রোগে এর প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

এই নাশক-বস্তুর বিষক্রিয়া মোটামুটি কম হলেও ক্লোরোমাইসেটিন ও পেনিসিলিনের মত এত কম নয়। সুতরাং প্রয়োগের সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা দরকার। তাছাড়া রোগের মূলীভূত ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাসের সঠিক ক্রিয়া নির্ধারণের জন্য এবং সেই জীবাণুর উপরে এরূপ নাশক-বস্তুর কার্যকারিতা কতটা ফলদায়ক হবে, তা জানার জন্য পরীক্ষাগারের সুবিধা থাকাও বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে এই ঔষধ খাওয়ান হয়; কঠিন রোগে অবশ্য সূচি-প্রয়োগও আবশ্যক হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'চার্লস ফাইজার' নামক বৃহৎ ঔষধ কারখানায় 1950 সালে স্ট্রেপটোমাইসিন রিমোসাস

নামক একটি নোমাইসিন গোষ্ঠীর অণু-ছত্রাক থেকে ই. কিউ. কিং টেরামাইসিন নামক হলদে কেলাসিত একটি নাশক বস্তু আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের আগে এই কারখানার কর্মীরা নানা দেশ থেকে সংগৃহীত প্রায় এক লক্ষ নমুনার মাটি পরীক্ষা করেন। অরিও-মাইসিন ও ক্লোরোমাইসেটিনের মত 'গ্র্যাম-পজিটিভ' ও 'গ্র্যাম-নেগেটিভ' বিভিন্ন জীবাণুর উপর এর ক্রিয়া প্রবল। তা ছাড়া স্পাইরোকীট, রিকেটসিয়া ও কয়েকটি ভাইরাস ও প্রোটোজোয়া-ঘটিত কতকগুলি কঠিন রোগেও এর ব্যবহার আছে।

পেনিসিলিনের তুলনায় এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। গ্লুকোজ, ও লবণের দ্রবণে এ সহজে নষ্ট হয় না। পাকস্থলি থেকে এ সহজেই রক্তে ও তন্তুতে পৌঁছে। কিন্তু পেনিসিলিনের চেয়ে ধীরে ধীরে শরীর থেকে নির্গত হয়। সাধারণতঃ রোগীকে এ ঔষধ খাওয়ান হয়। কঠিন রোগে সূচি-প্রয়োগ করা দরকার হয়।

ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন ও অরিওমাইসিনকে 'broad spectrum antibiotic' বলা হয়, কারণ এরা অনেকগুলি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন পর্য্যায়ের রোগজীবাণুকে প্রতিহত করে। তবে এত শক্তিশালী বলেই এদের ব্যবহার বিচক্ষণ চিকিৎসকের তত্বাবধানে হওয়া আবশ্যক, কারণ ঠিক কোনটি কোন বিশেষ রোগে সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে, ঔষধের মাত্রা গোড়ায়

কত হওয়া দরকার, কতদিন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে, কোন উপসর্গে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে—এই সব খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা আনাড়ির কাজ নয়। তা ছাড়া কোন ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে আর একটিকে বা কোন ক্ষেত্রে এদের কোন একটির সঙ্গে সালফা পর্যায়ের ঔষধের সহপ্রয়োগ করলে উপকার বেশী বা দ্রুত হতে পারে, তাও জানা দরকার। অন্য পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ঔষধ অন্যটির ক্রিয়া নষ্টও করতে পারে। এ সব কারণে ডাক্তারের অজ্ঞাতে নির্বিচারে এরূপ শক্তিশালী ঔষধ ব্যবহার করলে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

এ ছাড়া টেট্রাসাইক্লিন, টাইরোথ্রিসিন, পলিমিক্সিন, নিওমাইসিন, এরিওমাইসিন, ভায়োমাইসিন, ফিউসি-গ্যালিন, নিষ্টেটিন ও এনাইসোমাইসিন ইত্যাদি আরও কতকগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত নাশকবস্তু নিয়ে অধুনা বিভিন্ন গবেষণাগারে নানা রকম বিস্তৃত পরীক্ষা চলছে। স্থানাভাবে এবং বাহুল্য ভয়ে সেগুলির আলোচনা করা এখানে সম্ভব হোল না।

ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন, অরিওমাইসিন প্রভৃতি মুখে খেতে দিলে প্রায়ই বৃহদন্ত্রের সকল রকমের জীবাণুকে সমূলে নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং তাদের যেগুলি ভাইটামিন-বি সমষ্টি বা ভাইটামিন-কে তৈরি করে তারাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য ঐ সকল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাইটামিনগুলি প্রচুর পরিমাণে খেতে দিতে হয়।

পরিভাষা ও টীকা

অক্সিডেসন-Oxidation, অক্সিজেনযোগ (রাসায়নিকভাবে);

অণু-ছত্রক—Mold, ছত্রকগোষ্ঠীর এক অতিক্ষুদ্রাকার শাখা;

অনচ্ছতা—Turbidity, অবদ্রব—Emulsion

অবায়ুজীবী—Anaerobic, বায়ুজীবী—Aerobic

অম্ল—Acid, অম্লত্ব—Acidity

অস্‌মস্ চাপ—Osmotic pressure

অষ্টিওমায়েলাইটিস—Osteomyelitis

অ্যাক্‌টিনোমাইসিস—ছত্রক ও ব্যাক্‌টিরিয়ার মাঝামাঝি অস্থিবিকৃতি রোগ জীবাণুর পর্যায়ভুক্ত একরূপ ক্ষুদ্র জীবাণু

অ্যাক্‌টিনোমাইসিস অ্যান্টিবাইওটিকাস—Actinomycis antibioticus

,, ল্যাভেনডুলি—Actinomycis levendulae

অ্যান্‌থ্রাক্স—Anthrax (wool gatherer's disease)

অ্যাপ্লিকেটর—Applicator

অ্যামাইল অ্যাসিটেট—Amyl acetate

অ্যাম্পুল-Ampoule, ঔষধ রাখার দুই মুখবদ্ধ ক্ষুদ্র কাচনল;

অ্যালবার্ট সুল্‌ট্স—Albert Schults

অ্যাস্‌পারজিলাস ক্লাভাটাম—Aspergillus clavatum

,, ফিউমিগেটাস ,, fumigatus

,, ফ্লাভাস ,, flavus

অ্যাসিড-ফাস্ট—Acid-fast, অম্লরোধক (অণুবীক্ষণে দেখার জন্য জীবাণুগুলি কাচের স্লাইডের উপর জৈব রঞ্জকে রাঙিয়ে লওয়া হয়। এই স্লাইড লঘুকৃত সালফিউরিক অম্লে ডোবালে কতকগুলি জীবাণুর রং ঠিক থাকে। এ গুলিকে বলে acid-fast, অন্যগুলির রং এ-প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়)।

আগার—Agar, সামুদ্রিক শৈবাল (Sea-weed) থেকে প্রাপ্ত বস্তু, গরম জলে গুলে ঠাণ্ডা করলে জেলির মত জমে যায়। জীবাণু জন্মাবার ও বাড়াবার কাজে এর ব্যবহার।

আঠাধর্মী প্রোটিন—Mucin

অ্যান্‌ডুলেণ্ট ফিভার-Undulent fever, এই জ্বরে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি অত্যধিক ঘটে, আবার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ হলেও বার বার জ্বরের আক্রমণ হয়। ভাইরাস-ঘটিত রোগ।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং—Alexander Fleming

অবদ্রব, ইমালশান—Emulsion

ইলিউসান—গুঁড়া-শোষকে শোষিত বস্তু দ্রবণের সাহায্যে পুনরুদ্ধার।

উত্তেজক বস্তু—Stimulant, যে বস্তুর প্রয়োগে মাধ্যমে শাসকের পরিমাণ বাড়ে।

উপনিবেশ—Colony (কলোনি), ব্যাক্‌টিরিয়া বা ছত্রকের উপ্তি-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে গোলাকারে বৃদ্ধি।

উপপ্রজাতি—Subspecies, প্রজাতি—Species

এইচ. বি. উড্‌রফ—H. B. Woodruff

এল্কটন সহর—Elkton

এণ্ট্‌আমিবা কোলাই—Entamoeba coli, অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোজোয়া বিশেষ।

এফ. ডব্লু. টর্জ—F. W. Torz; ঔষধরোধী—Resistant

এস্টার—অ্যাসিড (অম্ল) ও কোহলের সংযোগে উৎপন্ন রাসায়নিক বস্তু।

O. S. R. D.—Office of Scientific Research and Development;

কন্টিনিউয়াস-প্রেসার-ফিল্‌টার—Continuous-pressure Filter; এই যন্ত্রে ফিল্‌টার কার্য ক্রমাগত চালান যায়।

কাপ-প্লেট প্রণালী—Cup-plate method

কালচার-Culture, বপন, উপ্তি-কার্য, অন্যক্ষেত্রে উপ্তি-মাধ্যম—যে মাধ্যমে জীবাণু জন্মানো হয়েছে।

কোয়াড্রুপ্ল-এফেক্ট ইভাপোরেটার—Quadrupple-effect Evaporater (দ্রবণকে দ্রুত ঘনীভূত করার বিশেষ যন্ত্র)।

কুম্ভকর্ণ রোগ—Sleeping sickness

ক্লাটারবাক—Clutterbuck, ক্ষারধর্মী—Alkaline

ক্ষুদ্রান্ত্র—Small intestine

গ্যাস-গ্যাংগ্রিন – Gas-gangrene, গ্যাস-উৎপাদনসহ ক্ষতের পচন রোগ, ব্যাসিলাস ওয়েলসাই নামক জীবাণুর ক্রিয়ায় ঘটে।

গ্র্যাম-পজিটিভ—Gram positive, জেন্‌সিয়ান-ভায়োলেটে রঞ্জিত জীবাণু 'লুগল'-আয়োডিন দ্রাবণে ডুবিয়ে কোহলে ধৌত করলে যে-গুলোর রং উঠে যায় না তাদের বলা হয় গ্র্যাম-পজিটিভ জীবাণু ; আর যাদের রং একেবারে ধুয়ে যায় তারা হল গ্র্যাম-নেগেটিভ। অণুবীক্ষণে দেখবার জন্য গ্র্যাম-নেগেটিভ জীবাণুকে তখন অন্য রঙে রঙিয়ে নিতে হয়। এইভাবে জীবাণুদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

গ্রামিসিডিন-এস—Gramicidin S

গ্রূপ—Group, পরমাণুগুচ্ছ ; জৈব বস্তুর সক্রিয়তা কতকগুলি পরমাণুগুচ্ছের কারণে ঘটে। জলে-OH, অ্যামেনিয়াতে-NH, ইত্যাদি গুচ্ছ আছে।

চারকোল—Charcoal, কাঠকয়লা-জাতীয় কার্বনপ্রধান বস্তু। কাঠকয়লা ছাড়া, নারিকেল-ছোবড়া, ভুষি, হাড় ও রক্ত থেকেও প্রস্তুত হয়।

চেইন—Chain (একজন বিজ্ঞানী)

চার্ল্‌স ফিজার—Charles Pfizer যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিরাট ঔষধ প্রতিষ্ঠান।

জালক বা সূতালি—Mycelium, ছত্রকের দৃশ্যমান অংশ।

জীবাণুজারক বস্তু—Bacteriophage, ব্যাক্‌টিরিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন, তাদের নাশকারী বা জারণকারী বস্তু। এর মধ্যে অতিসূক্ষ্ম জীবাণু থাকে।

জীবাণুনাশক-Bactericidal ; জীবাণুবারক-Antiseptic

জীবাণুশাসক বা শাসক—Antibiotic

জীবাণুস্তম্ভক—Bacteriostat, যা জীবাণুর বৃদ্ধি স্থগিত করে। জীবাণুমোচন বা জীবাণুমুক্ত করা—Sterilize, জীবাণুমুক্ত—Sterile, জীবাণুসঞ্চার—Inoculation

জেনসিয়ান ভায়োলেট—Gentian violet, কৃত্রিম রঞ্জক বস্তু ;

টাইরোথ্রিসিন—Tyrothricin

টারবিডিমেট্রিক—Turbidimetric

টু-স্টেজ কাউণ্টার কারেণ্ট—Two-stage counter current ;

টেস্ট-নল—Test tube, ডব্লু. ডি. ফ্রস্ট—W. D. Frost

ডি. হেরেল—d'Herelle

ডি. এস. কীফার—**D. S. Keefer**

তাপসংস্থান—Incubation, জীবাণুবৃদ্ধির জন্য মাধ্যমকে উপযুক্ত তাপে রক্ষণ।

দ্রবণ—Solution ; দ্রাবক—Solvent

নাশপ্রবণ—Susceptible, sensitive

নিঃসারণ—Elution, গুঁড়া-শোষকে শোষিত বস্তু উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে পুনরুদ্ধার।

পর্যায়ক্রমে বিরলীকরণ—Serial dilution

পলিপেপ্‌টাইড—Polypeptide, প্রোটিনের জারণে উৎপন্ন সরলতর বস্তু।

পাইরোজেন—Pyrogen, জ্বর-উৎপাদক একপ্রকার অজ্ঞাত প্রকৃতির বস্তু।

পাস্তুরিত—Pasteurised, পাস্তুরিত করা —Pasteurise

পুনঃপ্রকোপ—Relapse ; পৃষ্ঠবিততি-Surface tension

পেট্রি-ডিস—Petri-dish ; পেনিওরাল—Penioral

পেনিসিলিয়াম নোটেটাম—Penicillium notatum

,, সাইক্লোপিয়াম— ,, cyclopium

,, সিট্রিনাম— ,, citrinum

,, স্পাইনুলোসাম— ,, spinulosum

পোষক বা পোষক-বস্তু—Nutrient

পোষক-মাধ্যম—Culture, যে মাধ্যমে জীবাণু জন্মানো হয়েছে।

পৌনঃপুনিক জ্বর—Relapsing fever

প্রজাতি—Species ; উপপ্রজাতি—Subspecies

প্রোকেন--Procaine, স্থানীয় চেতনালোপী কৃত্রিম বস্তু।

ফন হায়ডেন—Von Hayden

ফ্যাগোসাইট—Phagocyte, রক্তের শ্বেতকণিকার মধ্যে যেগুলি বিভিন্ন বিকৃত-তন্তুকোষ, বিষবস্তু ও ব্যাক্‌টিরিয়া বিনষ্ট করে।

ফ্লোরি—Florey ; বিষক্রিয়া—Toxicity

বায়ুজীবী—Aerobic, অবায়ুজীবী—Anaerobic

বিশোষণ—Absorption, শোষণ—Adsorption

বিষবস্তু—Toxin ; ব্যাংস ডিজিজ—Bang's disease

ব্যাক্‌টিরিওফাজ—Bacteriophage, ব্যাক্‌টিরিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন তাদেরই নাশকারী বা জারণকারী বস্তু, এর মধ্যে একপ্রকার অতি-সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে।

ব্যাক্‌টিরিয়াল ফিল্‌টার—চিনামাটির সূক্ষ্ম ছাঁকন-যন্ত্র, এর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে জীবাণু গলে না।

ব্যাসিলাস—Bacillus, অতি ক্ষুদ্র কাঠির মত আকৃতিবিশিষ্ট ব্যাক্‌টিরিয়ার শ্রেণীবিশেষ।

ব্যাসিলাস-ঘটিত—Bacillary

ব্যাসিলাস ব্রুসী—Bacillus Brucei

,, ব্রেভিস— ,, Brevis

,, শীগা— ,, Shigai

ভাইরাস—Virus, জীবাণুর চেয়ে ও সূক্ষ্মতর জীবনের প্রকাশ; এদের সাধারণ অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একে আলাদা করা গেছে। উপযুক্ত মাধ্যমে জীবাণুর মতোই এরা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফাস, বসন্ত, হাম, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগ এদের ক্রিয়ায় ঘটে। উদ্ভিদের অনেক রোগও এরা ঘটায়।

মাংসরস—Broth মার্ক কোম্পানি—Merck Co. ;

মাধ্যম—Medium, স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত যে দ্রবণে জীবাণু জন্মান হয়।

মেথিলিন গ্লাইকল—Methylene glycol, এই জৈব দ্রাবণের জীবাণু-নাশক শক্তি আছে।

মূত্রাশয় বা বস্তি—Bladder, Kidney—বৃক্ক

মেরুনালী—Spinal canal

রক্তমস্তু—Serum, রক্ত জমাট হওয়ার পরে যে তরল অংশ তা থেকে নিঃসৃত হয়।

রক্তরস—Plasma, রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা বাদ দিলে যে তরল অংশ থাকে।

রবার্ট কগহিল—Robert Coghill

রাইস্ট্রীক—Raistrick ; রাওয়ে সহর—Rahway

রেণু—Spore (স্পোর), ছত্রক ও ব্যাক্টিরিয়ার বীজধর্ম্মী অংশ।

রেনি ডুবস—Rene Dubos, রোগপ্রবণ—Sensitive

র‍্যাবিট-ফিভার—Rabbit fever (*tularaemia*), ভাইরাস-ঘটিত রোগ, বিশেষ কতকগুলি বন্য ক্ষুদ্র পশু এর ভাইরাস বহন করে।

লভেল—Lovell (একজন বিজ্ঞানী)

লাইকেন—Lichen, কোন কোন শ্রেণীর ছত্রক ও শৈবালের সমবায়।

লাইসোজাইম—Lysozyme, নানা উদ্ভিজ্জে এবং প্রাণি-নিঃস্রাবে বিদ্যমান মৃদু শাসকবস্তু। রাসায়নিক প্রকৃতি অজ্ঞাত।

লিলি কোম্পানি—Lily Co. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ ঔষধ প্রতিষ্ঠান।

লেডারলে—Lederle ; শক্তিনির্ণয়—Standardisation

শাসক বা জীবাণুশাসক—Antibiotic

শোষণ—Adsorption, সূক্ষ্ম গুঁড়া-বস্তুর মধ্যে দ্রবণ থেকে দ্রাব্য বস্তুর প্রবেশ। বিশোষণ—Absorption

সঞ্চরণ-ক্রিয়া—Diffusion ; সন্ধান—Fermentation

সাল্‌ফানিলএমাইড—Sulphanilamide, ব্যাক্টিরিয়ারোধী গন্ধকঘটিত একপ্রকার কৃত্রিম ঔষধ, যা খাওয়ালে বা সূচি-প্রয়োগ করলে রোগ দূর হয়।

সিংগ্‌ল-সট প্রোডাক্ট—Single-shot product

সিলিণ্ডার-কাপ প্রণালী—Cylinder-cup method

সূচি-প্রয়োগ বা সূচিবেধ—Injection

সূতালি বা জালক—Mycelium, ছত্রকের দৃশ্যমান অংশ।
সেলমান এ. ওয়াক্সম্যান—Selman A. Waksman
স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়স—Staphylococcus aureus
ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস—Streptomyces griseus
স্পোর—Spore, রেণু ; স্বয়ংক্রিয়—Automatic
হিস্টামিন—Histamine, হিস্টিডিন নামক অ্যামিনো-অ্যাসিডের (অম্লের) বিকারে উৎপন্ন রক্তের চাপবর্ধক একপ্রকার বিষবস্তু।
